তুলি কলম

১৪৩০

Call Piyush Ashra
(720) 838 3777

VIBRANT REAL ESTATE

Looking for Full Time Experience, Knowledgeable & Reliable Real Estate Agent?

Who can guide you through complete process of HOME Buying & Selling?
Who knows the market!!!

MB Vibrant Real Estate, Inc Email: - realtorpa@gmail.com

Ask for New Home Construction Rebates

Serving All Your Real Estate Needs

- *First time home Buyers*
- *Multi-family homes*
- *Relocation*
- *New Construction*
- *Land / Investment properties*
- *All type of Residential properties*

"I LOVE REFERRALS, because 95% of my business comes from REFERRALS."

Experience, Hard Work, Honesty & Knowledge creates Success"

MetroBrokers

তুলি কলম

শারদ শুভেচ্ছা

১৪৩০

সভাপতি : *অনুরাধা মুখার্জি*

প্রচ্ছদ : *যশ মৌলিক*

অলংকরণ : *বিপাশা ভট্টাচার্য*

সম্পাদনা : *ইন্দ্রাণী রায়, গার্গী ভট্টাচার্য, বিপাশা ভট্টাচার্য*

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....2

সভাপতির কলমে.....3

প্রবন্ধ

দুর্গাপূজা – সেকাল থেকে একাল : *প্রবণ পালন চট্টোপাধ্যায়*.....4

অঙ্কন : দুগগি ও সিংহমশাই : *মিহিকা ভট্টাচার্য (7-year-old)*.....5

ভ্রমণ

একটা অন্যরকম ছুটির দিন : *রুচিরা রায় বর্মন*.....6

কবিতা

- লক্ষ্যভেদ : *বিপাশা ভট্টাচার্য*.....9
- শরতের আকাশ *: মিত্রা মুখার্জী*.....9

ছোটদের গল্প

- The note of H : *Aharshi Roy (10-year-old)*.....10
- The staff of the dead : *Anush Roy (10-year-old)* 12

অনুগল্প

রো-মানুষের গল্প : *অমিতাভ রক্ষিত*.....15

কবিতা

- এক ব্যর্থ রাজার গপ্প : *অনন্য বন্দ্যোপাধ্যায়* 16

রম্যরচনা

- দ্বীপের নাম হাভার : *অমিত নাগ*.....19
- হাসির অন্তরালে : *অভিজিৎ সেনগুপ্ত*.....22

কবিতা

- তাপ-রাক্ষস : অনিন্দ্য বসু.....23
- বাঁশি : *গার্গী ভট্টাচার্য*.....23

বিনোদন : শহর থেকে শহর

- পেটপুজো @ কলকাতা : *মৌ পাল* ও *অভিষেক রায়* 24
- পেটপুজো @ ডেনভার : *অম্বরীশ নাগ* (অনুলেখন : *বিপাশা ভট্টাচার্য)* 26

ফিচার

Unite to Uplift and Surabhi Mehrotra – when communities join hands : *Gargi Bhattacharya*....28

অঙ্কন : *দীপিকা ঘোষ মৌলিক*.....21, 29

গল্প

- না বলা বাণীর : *শুভা আঢ্য*.....30
- মিঠেপান : *মৌ পাল*.....33

সম্পাদকীয়

শুভ শারদীয়া ১৪৩০।

আমাদের ‘মিলনী’ পরিবার ও তার সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত বাঙালি পাঠক-পাঠিকা ও লেখককূলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসাই আমাদের এই ‘তুলি-কলম’ পত্রিকার উদ্দেশ্য।

আপামর বাঙালির বড় সাধের, বড় গৌরবের দুর্গাপুজোর সাথে যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে শরতের নির্মল আকাশ, ঢাকের বোল, কাশের দোল আর ডাকের সাজের ইমেজারি; তেমনই, বাঙালি পাঠকের কাছে দুর্গাপূজার এক অপরিহার্য অঙ্গ শারদীয়া পত্রপত্রিকা ও পূজাবার্ষিকীর নস্টালজিয়া। সেই অমোঘ আকর্ষণের কথা মাথায় রেখেই, আমাদের প্রবাসী, সাহিত্যপ্রেমী বাঙালিদের উদ্যোগে আজ বহু বছর ধরে ‘তুলি-কলম’-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যই, প্রতি বছরের মতো এবারেও ‘তুলি-কলম’ সেজে উঠেছে ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী লেখক-লেখিকা ও চিত্রশিল্পীদের কর্মসম্ভারে।

‘তুলি-কলম’-এর প্রতিটি পাতায় বৈচিত্র্য, আবেগ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে সুধী পাঠকবৃন্দের মতামতের অপেক্ষায়।

এই বছরের ‘তুলি-কলম’-এর নেপথ্যে রয়েছে তিনজন সম্পাদিকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়। গার্গী ভট্টাচার্য এঁদের মধ্যে ‘মিলনী’র নবীনতমা সদস্যা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সৃজনশীল পরিকল্পনা ও যেকোনো কাজের প্রতি অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের ‘তুলি-কলম’ এবং সার্বিকভাবে ‘মিলনী’র অন্যান্য কাজগুলিকে বিশেষভাবে ঋদ্ধ করেছে। বিপাশা ভট্টাচার্য ‘মিলনী’ পরিবারের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর জড়িত। বয়েসে সবথেকে নবীন হয়েও, বাংলা ভাষার দক্ষতা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগে তিনি হয়ে উঠেছেন ‘তুলি-কলম’ সম্পাদনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমস্ত বাংলা লেখাগুলির বানান, ব্যকরণ ও যতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত যত্ন ও ধৈর্য সহকারে সম্পাদনা করার দায়িত্ব তিনি সুসম্পন্ন করেছেন। পরিশেষে আমাদের দলনেত্রী ইন্দ্রাণী রায়। আমাদের পত্রিকা সমিতির কর্ণধার। বহু বছর ধরে ‘মিলনী’র সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি যেমন একাধারে দায়িত্বশীল অভিভাবকের মতো আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে সাহায্য করেছেন, পথপ্রদর্শন করেছেন, তেমনই একার কাঁধে তুলে নিয়েছেন পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বাণিজ্যিক কাজ সামলানোর গুরুদায়িত্ব।

বাঙালি চিরকালই সৃজনশীল জাতি। এই বহমান সৃজনশীলতার বিচিত্র সম্ভারের প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে পারা আমাদের কাছে সৌভাগ্যের বিষয়। ‘তুলি-কলম’-এর এবছরের শারদ সংখ্যায় সাত থেকে নব্বই বছর বয়সী বহু গুণী লেখক-লেখিকা ও চিত্রকরের প্রতিভাকে দুই মলাটের ভিতর সামিল করতে পেরে আমরা যারপরনাই আনন্দিত।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের প্রথম পছন্দ ছিল অপ্রকাশিত এবং মৌলিক রচনা ও চিত্রকলা; কিন্তু তবুও, শুধুমাত্র রচনাশৈলীর গুণমান এবং আমাদের পত্রিকার এই প্রশস্ত বৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্যেই দুটি পূর্বপ্রকাশিত লেখাকেও আমরা সানন্দে ‘তুলি-কলম’-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি।

পরিশেষে বলি, আমরা কেউই পেশাগত লেখক-লেখিকা কিংবা সম্পাদক নই। মনের আনন্দে, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থেকেই এই ‘তুলি-কলম’ পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে ব্রতী হয়েছি। তাই আশা রাখি, কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকলে পাঠক নিজগুণে তা ক্ষমা করে নেবেন।

‘তুলি-কলম’ এবং ‘মিলনী’র পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকলের শারদীয়া আনন্দমণ্ডিত হোক।

ধন্যবাদান্তে,
ইন্দ্রাণী রায়
গার্গী ভট্টাচার্য
বিপাশা ভট্টাচার্য।

সভাপতির কলমে

শুভ শারদীয়া!!

সমস্ত বন্ধু ও প্রিয়জনদের মিলনীর দুর্গোৎসবে জানাই সাদর আমন্ত্রণ!

নয় নয় করে, মিলনীর সাথে আমার সংযোগের প্রায় ২৫ বছর হয়ে গেল। মনে আছে প্রথম বছর প্রবাসে, মিলনীর দুর্গাপুজোতে বড়রা কিভাবে আপন করে নিয়েছিলেন। তাদের আজও যেকোনো কাজে পাশে পাই। তারপর কত বন্ধু, কত হইহই, কত অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রথম দেশে পুজো দেখার জন্য মন খারাপ হত। কিন্তু আস্তে আস্তে এই প্রবাসে মিলনীর পুজো বড় আপন হয়ে উঠল। পুজো ঘিরে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায় গরমের ছুটির সময় থেকেই। মাঝে মাঝে মনে হত সবকিছু সামলে, পুজোর রিহার্সাল-এর সময় পাবো তো? গত ২৫ বছরের কত স্মৃতি। কত নাটক, কত নাচ গান, কত আড্ডা। স্টেজ ডেকোরেশন থেকে শুরু করে ঠাকুরের ভোগ, সবেতেই গত ২৫ বছর ধরে ভাগ নিয়েছি। আমরা আর আমাদের ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠা। এখন আর মিলনীর পুজো ছেড়ে কোথাও যেতেই ইচ্ছে করে না।

আমরা যেমন বড় হয়েছি, মিলনীও আগের থেকে অনেক বড় হয়েছে। আজ মিলনীর ৫০০-র বেশি সদস্য। আগেই লিখেছি, মিলনীর সঙ্গে আমার যাত্রা শুরু ২৫ বছর আগে। প্রথম মিলনী কমিটিতে যোগ দিই ২০০০ সালে। তারপর আরো বেশ কয়েকবার মিলনী কমিটির সদস্য হিসেবে সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বে ছিলাম। সেই সূত্রে কলকাতার বহু গুণী শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংস্পর্শে আসা। তবে এই প্রথম সম্পূর্ণভাবে মিলনীর দায়িত্ব নিলাম। ২০২৩-এর সব ইভেন্টগুলো সুষ্ঠভাবে সংগঠিত করার দায়িত্ব খুব সহজ ছিল না। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ সমস্ত জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া। তার উপর স্কুলগুলির সময়সূচি আর নীতির সাথে মানিয়ে পরিকল্পনা করা! কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি সবকিছুর গুণমান বজায় রাখতে। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; কোনকিছুর ব্যাপারেই আমরা আপস করিনি।

পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের যেমন পাশে পেয়েছি, তেমনি বহু নতুন ভাই, বোন, বন্ধু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই ২০২৩-এর কমিটি হিসেবে যেটুকু করতে পেরেছি, তার সমস্ত কৃতিত্ব প্রত্যেকটি কমিটি মেম্বার-এর প্রাপ্য। তাছাড়া কমিউনিটি মেম্বার-রাও সর্বতভাবে সবদিক দিয়ে সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে যারা অনুদানের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

আমরা ঘরে বাইরে, সংসার এবং কাজ সামলে, আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মিলনীর ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সবার পুজোর দিনগুলো আনন্দে কাটুক। আগামী বছরের জন্য রইলো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকবেন।

"না থাকে অন্ধকার,

না থাকে মোহপাপ,

না থাকে শোকপরিতাপ।

হৃদয় বিমল হোক,

প্রাণ সবল হোক,

বিঘ্ন দাও অপসারি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি"

-অনুরাধা মুখার্জি।

দুর্গাপূজা - সেকাল থেকে একাল

প্রবণ পালন চট্টোপাধ্যায়

বাঙালির সমাজ জীবনে অসুরদলনী দুর্গাপূজা এক প্লাবিত আনন্দধারার মতো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই দুর্গাপূজার আদি ইতিহাস খুঁজতে বিভিন্ন পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক বিস্তর গবেষণার মাধ্যমে নানান তথ্য আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় ক্রমান্বয়ে পার হয়ে, নানান বিবর্তনের পর আজকের আলোকোজ্জ্বল শারদীয়া দুর্গোৎসব।

ঋগ্বেদের দুটি সূক্তে মহাদেবীর প্রধান যে দুটি রূপ ধারাবাহিত হয়ে একাল পর্যন্ত চলে এসেছে, তার একটি হলো, জানপদরূপ : জগদ্ধাত্রী, সর্বশক্তি; এবং অপরটি হলো, আরণ্যরূপ : জগন্মাতা (দুর্গা), সর্বমঙ্গলা।
আমাদের দুর্গা প্রতিমার মধ্যে রয়েছে মাতৃস্বরূপা, করুণাময়ী মূর্তি। এই মহিষমর্দিনী দেবীপূজা ভারতবর্ষে অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকেই প্রচলিত। চিদাম্বরমের 'নটরাজ মন্দির' মহাবলীপুরম, খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানের প্রস্তরে খোদিত 'মহিষাসুরমর্দিনী দেবীমূর্তি' এর সাক্ষ্য বহন করে। দুর্গাপ্রতিমায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের মূর্তির সংযোজন মোটামুটিভাবে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরের আনাতোলিয়ায় সিংহবাহিনী দেবীমূর্তির প্রচলন ছিল। তাঁর মতে, "আমাদের দুর্গা অংশত বিদেশী, অংশত দেশীয় দেবতা । এই দেবতা ঊষা ও অপ্সরা হৈমবতীর যুক্ত রূপ।"
বাংলাদেশে প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। রাজসাহী জেলার তাহিরপুরে রাজা কংসনারায়ন রায় কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মহাসমারোহে এই পূজার ব্যবস্থা করেন। তাহিরপুরের রাজবাড়িতে আজও সেই একই মন্ডপে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এপার বাংলায় কলকাতার প্রাচীনতম পূজা বলতে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের পূজোকেই বোঝায়। ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর জব চার্ণক সাবর্ণদের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী স্বত্ত্ব কিনে নেন। ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে সাবর্ণরা পাকাপাকিভাবে সরে আসেন বরিষায়। সেখানকার আটচালা মন্দিরের ভগ্নস্তুপ স্মৃতির মধ্যে বনেদি আচার-অনুষ্ঠান মেনে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই পূজা আজও অনুষ্ঠিত হয়।
বারোয়ারি পূজার প্রথম প্রবর্তন হয় হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায়। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে, ১২ জন ব্রাহ্মণ একত্রিত ভাবে এই মহাপূজার আয়োজন করেন। অনুমান করা হয়, মহামারী বা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই পূজার আয়োজন।

কিন্তু, দুর্গাপূজার প্রকৃত আমেজ, আনন্দ, ঐকান্তিকতা সবই বহমান পারিবারিক পুজোয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমিদার, বিত্তশালী এবং উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে ক্রমে ক্রমে দুর্গাপূজার প্রসার ঘটে। কলকাতায় শত বৎসর বা তারও অধিক পুরনো পারিবারিক পুজোর মধ্যে শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ি, জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ি, বেহালা সত্যেন রায় রোডে মহারাজা গজেন্দ্রনারায়ন রায়ের বাড়ি, নীলমনি মিত্র স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণের বাড়ি, বিডন স্ট্রিটে ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বাড়ির পূজা অন্যতম।একইভাবে মফঃস্বল জেলাগুলির বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন পূজা। এর মধ্যে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে গোঁসাই বাড়ি, দে-বাবুদের বাড়ির পূজা, তালান্ডু মালীপাড়া গ্রামে মুখোপাধ্যায় পরিবারের বুড়িমার পুজো, নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে, বর্ধমান, হাওড়া জেলায় বহু প্রাচীন পারিবারিক পুজো আজও অনুষ্ঠিত হয়।

এই সমস্ত পুজোর একধারে ছিল হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে বিত্তের উৎসব, নীলকন্ঠ পাখি ওড়ানো, বন্দুকের গর্জনে জমিদারি মেজাজ, সাহেব ও মেমসাহেবদের তোষামোদি আপ্যায়ন, মদ্যপান, বাইজি নৃত্য-গান এবং ভোজনের এলাহী বাবুয়ানা; তেমনই অন্যদিকে ছিল বিশুদ্ধ, আন্তরিক শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ, দানধ্যান, হিন্দুধর্মের সনাতন গাম্ভীর্য, বিনয়, ভালবাসা এবং সমর্পণ। থামওয়ালা পূজার দালানে ঝাড়লণ্ঠনের মায়াবী আলো, চালচিত্র দেওয়া শোলার সাজ বা ডাকের সাজে সজ্জিত মাতৃমূর্তি, পূজার্চনার পবিত্র, স্নিগ্ধ পরিবেশ, শাস্ত্রসম্মত উদাত্ত, অনুরণিত মন্ত্রোচ্চারণ, ভক্তি, সমর্পন, গাম্ভীর্য মিলিয়ে আজও এই মাতৃপূজা ঐতিহ্যের ধ্বজা বহন করে চলেছে।

পাশাপাশি আজকের বারোয়ারি পুজোগুলি আলোর রোশনাই, মণ্ডপ ঘিরে শিল্পকর্ম, দেবীমূর্তির পরিবর্তিত শৈল্পিক রূপ, জনজোয়ার, মাইকের দানবীয় উপস্থিতি, পুজোর সঙ্গে পুজোর প্রতিযোগিতা, খাওয়াদাওয়া এবং অনেকক্ষেত্রেই কিছু অসংযত দর্শকের মাত্রাজ্ঞানহীনতায় ভরপুর।
সমরেশ বসুর কথায় বলি, "মনে হচ্ছে নাকি, আমি দেশের অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শিখিনি? এখনও সেই ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুরের মানসিকতা নিয়ে পড়ে আছি? তবে হয়তো তাই আছি। ... আমাদের শহুরে নতুন বংশধরেরা উৎকট আলোর ঝলকে আর ইমারতের গায়ে প্রতিধ্বনিত ঢাকের শব্দে অন্ধ আর কালা হয়ে রইলো। নিজের দেশটাকে দেখতে পেলো না, শুনতে পেলো না মানুষের কথা।"

==========

Painting: 'দুগগি ও সিংহমশাই'

Artist : *মিহিকা ভট্টাচার্য* (7-year-old)

একটা অন্যরকম ছুটির দিন

রুচিরা রায় বর্মন

জুলাই মাসের মাঝামাঝি, তবু এখনো আমাদের কলোরাডোতে গত কয়েকমাস ধরে প্রায় একনাগাড়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আকাশে মেঘের ঘনঘোর ঘনঘটা। ঝরো ঝরো বৃষ্টি সারাদিন নগর ও পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধূসর রঙের মেঘের ওড়না জড়িয়ে রেখেছে যেন! অবশ্য অনেক বছর পর এমন ব্যতিক্রমধর্মী বর্ষার দেখা পেলাম আমরা।

হঠাৎ করেই সেদিন শনিবার সকালে আমাদের আশ্চর্য করে দিয়ে মাইল-হাই সিটি ডেনভারের আকাশে ঝকঝকে সোনালি রোদের মিষ্টি আভার রেশ দিকে দিগন্তে ছেয়ে গেল। বৃষ্টিস্নাত ভেজা ঘাস আর ফুলের পাপড়িতে জড়িবোনা সোনা ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি জলের বিন্দুকে যেন এক একটি মূল্যবান রত্নের মতো উজ্জ্বল করে তুলল।

কানে আসছে ভোরের পাখিদের সুমধুর কলগীতি। স্বচ্ছ কাঁচের জানলা দিয়ে আসা স্নিগ্ধ আলোয় মুগ্ধ হয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। দেখলাম দীর্ঘ বর্ষণ শেষে মৃদুমন্দ শীতল বাতাস বয়ে চলেছে। মধুর সকাল গুটি গুটি পায়ে ঢুকে পড়েছে আমাদের ঘরে, আমাদের মনে। অনেকগুলি ভেজা ভেজা ভোরের পর নতুন কোনো আশা বুকে নিয়ে একটি শুভময় ভোর হলো যেন আজ। বেশ ক'টা উইকএন্ডে ঘরে বসে থেকে মন খুউব খারাপ ছিল। তাই সেদিনের সেই সকালটা আমাদের মনে এক অপরিসীম আনন্দানুভূতিতে ভরে দিয়েছিল।

অনেকদিন ধরেই দূরে কোথাও লং ড্রাইভে যেতে মন চাইছিল। তাই আজ আমরা দু'জনে মিলে ঠিক করলাম, "চলো না কোথাও একটা ঘুরে আসি!" ... যেমন ভাবনা তেমন কাজ! তাই সক্কাল সক্কাল বেশি দেরি না করে আদা দিয়ে বানানো গরম গরম চা ফ্লাস্কে ভরা হলো, কিছু পেপার কাপ, কয়েকটি জিপলক-ব্যাগে কাজুবাদাম, ঝাল চানাচুর, নাইস বিস্কুট ইত্যাদি চটপটি স্ন্যাক্স ভরে নিলাম। এর মধ্যে অবশ্য একটু সময় নিয়ে আমাদের ডেসটিনেশনটা ম্যাপ দেখে ঠিক করে নিলাম এবং প্ল্যান হলো পাহাড়ি শহর সিল্‌ভার্থর্নে কফি ব্রেক নিয়ে, স্টিমবোট স্প্রিংসে লাঞ্চ করে একেবারে আমাদের মূল গন্তব্যস্থলে পৌঁছাব এবং সেখানে এক রাতের জন্য হোটেল বুক করা হলো। ছোট্ট একটা ডাফল্ ব্যাগে আমাদের টুকটাক দরকারি জিনিস গুছিয়ে নিলাম। ব্যাস, আর কি! এরপর সকাল ন'টা নাগাদ আমরা পথে নামলাম। ...

"পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,

আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থী।"

সকালের নতুন সূর্যের আলো পড়ে রাস্তার দু'পাশের গাছগুলির হরেক রঙের ঝিরঝিরে সবুজ পাতাগুলোয় কেমন যেন এক রহস্যময় ছায়া তৈরি হয়েছে। হালকা নীলাভ আকাশে তুলতুলে সাদা মেঘের ভেলা বাতাসের আলতো ছোঁয়ায় অলসভাবে ভেসে চলেছে দূর থেকে দূরান্তে।

I-70 ও US-40 W হয়ে ডেনভার থেকে স্প্রিংবোট স্প্রিংসের দূরত্ব হলো ১৮১.৬ মাইল এবং সময় লাগে প্রায় ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। সেখানেই একটি 'থাই' রেস্টুরেন্টে আমাদের লাঞ্চ করার প্ল্যান। এই কয়েক ঘণ্টার ড্রাইভের মাঝখানে আরও দু-একবার রিফ্রেশমেন্টের জন্যে ব্রেক নিতে হয়েছিল। তাই এখানে পৌঁছতে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা মতো লেগে গেল।

'স্টিমবোট স্প্রিংস' হলো উত্তর কলোরাডোর ইয়াস্পা উপত্যকা এবং রকি পর্বতমালায় অবস্থিত একটি খুব সুন্দর শৈল শহর, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছয় হাজার নয়শো ফুট (২ হাজার ১০৩ মিটার) উপরে অবস্থিত। সারা বছরব্যাপী নানাবিধ এডভেঞ্চার এবং গ্রীষ্ম ও শীতকালীন স্পোর্টস সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে পরিপূর্ণ এই শহরটি। এখানকার ভূ-তাপীয় উষ্ণ প্রস্রবণগুলিতে থেরাপিউটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে জানা যায়। তাই সারা বিশ্বের লোকের কাছে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

অনেকক্ষণ ধরে ড্রাইভ করার পর বেশ চনমনে খিদে পেয়ে গেছিল আমাদের। তাই সেখানেই 'মাই থাই' বলে দারুণ একটি রেস্টুরেন্টে জম্পেশ করে লাঞ্চ সেরে নিলাম আমরা। ভেতো বাঙালি বলে কথা! ভাতের একটু খোঁজ পেলেই হলো। তাই প্রচুর পরিমাণে ভাত তরকারি (ফ্রায়েড রাইস আর নানা শাক-সবজি দিয়ে রান্না 'থাই-কারি') খেয়ে পেট তখন আইঢাই করছে। একটুক্ষণ গাড়িতে বসে জিরিয়ে নিয়ে, ফ্লাস্কে রাখা গরম চায়ে চুমুক দিয়ে, ভাত ঘুমকে বহুদূরে তাড়িয়ে দিয়ে আবার পথে নামলাম। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত সূর্য নিরলসভাবে আশেপাশের ট্রেইল ধরে হেঁটে চলা হাইকারদের উপর পড়ে ঝলমল করছিল। রোদের তাপে ঝকঝক করছে রকি মাউন্টেনের আঁকাবাঁকা সর্পিল পিচের রাস্তাগুলো। প্রকৃতির অগাধ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমরা এক ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম আমাদের আজকের মূল ডেসটিনেশন 'ক্রেইগ' নামক ছোট্ট একটি হিলস্টেশনে।

নরম মসলিনের মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা একটি গ্রাম এই 'ক্রেইগ'। সচরাচর এত সুন্দর তাজা সবুজ কলোরাডোর কোথাও আমি দেখিনি। চারিদিকে রংবেরঙ্গি প্রজাপতির মতো রঙ্গিলা পাখা মেলে আছে বুনো ফুলের ঝাঁক। সত্যি, মনে হয় কেউ যেন সবার অলক্ষ্যে সুন্দর ও সুচারু ভাবে একজন দক্ষ চারুকলা শিল্পীর মতো সূক্ষ্ম তুলির এক একটি টানে তাঁর নানা রঙে রাঙানো ক্যানভাসটিতে একটি রঙিন কাব্যের সৃষ্টি করেছেন।

আমরা যেখানে থাকি, সেই ডেনভার থেকে প্রায় দু'শো মাইল দূরে, উত্তর পশ্চিম কলোরাডোর দিগন্ত বিস্তৃত চারণভূমির মাঝে ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা প্রায় ছ'হাজার দু'শ ফুট। হাজার দশেক মানুষের বাস এখানে।

গ্রাম টি এমনই শান্ত সমাহিত, হঠাৎ এসে দাঁড়ালে মনে হয় যেন কোন এক আশ্রমে এসে পড়েছি। অধিবাসীদের প্রায় নব্বই শতাংশই হলো হোয়াইট আমেরিকান। আজকের পৃথিবীময় অবিশ্বাস আর হানাহানির মাঝে এরা যেন এক ভিন্ন গ্রহের মানুষ। যেন কোন শহুরে ধারা ওদের স্পর্শ করেনি- এতটাই সহজ, সুন্দর তাদের জীবন যাপন। এদের অনেকেরই প্রধান জীবিকা 'এল্ক' শিকার। এই বড় জাতের হরিণটি এখানে পাহাড়ে প্রান্তরে প্রচুর সংখ্যায় চরে

বেড়ায়। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে শিকারিরা এখানে 'এল্ক' শিকার করতে আসেন। এই জন্য ক্রেইগ-কে 'হান্টিং ক্যাপিটাল অব এল্ক' নামেও অভিহিত করা হয়।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, ওখানকার মানুষদের ব্যবহারে মনে হচ্ছিল যেন আমরা তাদের কতকালের চেনা! বয়স্ক, যুবক নির্বিশেষে সবাই কেমন খুব মিষ্টি আর শান্ত প্রকৃতির! সব সময় হেসে কথা বলছে। অথচ এরা নাকি প্রায় সবাই একএকজন বাঘা বাঘা শিকারি।

হোটেলে চেক-ইন করেই, ঘরে জিনিসপত্র রেখে একটু ফ্রেশ হয়েই আমরা ক্রেইগের ডাউনটাউন দেখতে এলাম। শহরের মাঝখানে একটা ছোট্ট সিনেমা হলে ছুটির দিনে ম্যাটিনি শো দেখার জন্য বেশ বড় লাইন পড়েছে। সেখানে মা-বাবা-বাচ্চারা, সবাই মিলে যেন এক মেলা বসেছে। আশেপাশে অনেকে গিটার বাজিয়ে গান করছে, কেউবা বাইরে স্টল সাজিয়ে সসেজ, স্যান্ডউইচ, চকোলেট, বিয়ার ইত্যাদি বিক্রি করছে। ওপরে নীল আকাশ, উপত্যকার স্নিগ্ধতা; ঘাসের, খাবারের ও পানীয়ের গন্ধ মিলে কেমন একটা মিষ্টি সুবাস ম-ম করছে চারিদিকে। সব মিলে সে এক আশ্চর্য বিকেল! কী আনন্দ সবার চেহারায়! যেন সারা পৃথিবী জুড়ে যতরকম অশান্তির ঢেউ গ্রামের সীমানার বাইরে এসেই থমকে গেছে! তাদের এই সরল জীবনযাত্রাই তাদের বর্ম।

স্নিগ্ধ হাওয়ায় আশপাশ থেকে ভেসে আসা কোন নাম-না-জানা সুগন্ধি ফুলের সুবাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিয়ে খুব শান্তি পেলাম আমরা। একটু এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়ালাম। অনেকের সঙ্গে গল্প করলাম। গরম গরম এল্কের সসেজ খেলাম। অপূর্ব তার স্বাদ। আবার হুজুগে পড়ে একটি সিনেমাও দেখে নিলাম।

সারাদিন কি ভাবে কেটে গেল, বুঝতেই পারিনি। হঠাৎই বিকেল পড়ে গিয়ে ঝুপ করেই যেন রাত নেমে এল পাহাড়ি সেই ছোট্ট মিষ্টি গ্রামটিতে। ব্ল্যাক-মাউন্টেনের গায়ে গায়ে পাইন বনের ফাঁকে ফাঁকে তখন প্রত্যেকটি বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে যেন কোন জাদুবলে আমরা এক অজানা 'তারার দেশে' এসে পৌঁছে গেছি।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা এবার হোটেলে ফিরে এলাম। পরের দিন সকাল বেলা হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা আবার ডেনভার রওয়ানা দিলাম। এত সুন্দর সবুজ মখমলে জড়ানো 'ক্রেইগ' এবং তার মিষ্টি মনের মানুষদের ছেড়ে বাড়ি ফিরতে মন চাইছিল না একদমই! তবু ফিরে যেতে হয়। সব ভালোরই তো একটি শেষ আছে!

হোটেল থেকে বেরিয়ে কিছুটা পথ ড্রাইভ করে গিয়ে গাড়িতে গ্যাস নিতে একটি গ্যাস স্টেশনে থামলাম। সেখানকার কর্ণার স্টোরটির ভেতরে ঢুকে কফি এবং কিছু প্যাস্ট্রি নিয়ে কাউন্টারে এলাম। তখন সেখানে কর্মরতা প্রায় আশি বছর বয়স্কা এক অতি সুন্দরী, সৌম্যকান্তি মহিলাকে বললাম যে আমরা পাঁচ ঘণ্টা ড্রাইভ করে ডেনভার ফিরে যাচ্ছি। ক্রেইগ-এ আমাদের দারুণ সময় কেটেছে। তিনি মিষ্টি হেসে জানালেন যে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন আমাদের ক্রেইগ ভাল লেগেছে বলে। তারপর আমাদের হতবাক করে হাসিমুখে বললেন, "Kiddos, coffee and pastry on me! You guys need it! Have a safe drive!"

প্রথমে একটু চমকে উঠলেও, হঠাৎ করে কোন এক সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের কাছ থেকে এমন বাৎসল্যের ছোঁয়া পেয়ে সত্যিই আমরা অভিভূত! একটা ঘোরের মধ্যে আবার চলতে আরম্ভ করলাম।

আমাদের গাড়িটা গ্রাম-পাহাড়-উপত্যকার সবুজ পেছনে ফেলে ইন্টারস্টেট হাইওয়ে ৭০-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে নিয়ে চলেছি সেই 'ক্রেইগ' নামক স্বপ্নঘেরা গ্রামটির কিছু মধুর স্মৃতি এবং তাদের দেওয়া এক ঝুড়ি অকৃত্রিম ভালবাসা। ...

কবিতা

লক্ষ্যভেদ

বিপাশা ভট্টাচার্য

চিরস্থায়ী ব্যথার পোশাক জড়িয়েছি প্রিয়,
চোখ ধুয়েছি সূর্যের লালে।
তবুও চোখের থেকে সমস্ত প্রাণ-
নিঃশেষে উদ্বায়ী।
মরা মাছের দৃষ্টিতে তোমার দিকে...
চাইব? কী করে বলো?
হে অনুগত গাণ্ডীব, ও দৃষ্টিতে তুমি
বেদনা চিনবে না-
অনুযোগ জানবে না-
আরো এক ছিলাছেঁড়া তীর বিঁধে-
লক্ষ্যভেদ করবে। কীর্তিমান।
জগতের কাছে।
অথচ হৃদয়ের কাছে বাকি ছিল কিছু ঋণ,
শুধিবার। ... শুধাবার।
কোমলস্বরে।
সমস্ত মন্দ্র আর্তনাদ, চাপা পড়ে গেছে,
পার্থ, তোমার গাণ্ডীবের বিজয় টঙ্কারে।

শরতের আকাশ

মিত্রা মুখার্জী

মা দুর্গা আসছে ঐ
চার ছেলেমেয়ে নিয়ে
ঢ্যাংকুড়াকুড় ঢ্যাংকুড়াকুড়
বাজছে চারদিকে।
স্থলে পদ্ম, জলে পদ্ম ফুটেছে একসাথে,
শিউলি ফুলের বৃষ্টি দেখো
শিউলি গাছের তলে,
শরতের মেঘ আকাশেতে
ভাসছে আপন মনে...
কাশ ফুলেরা দুলছে কেমন
হাওয়ায় দোলা লেগে।
মা দুর্গা আসছে ঐ...
চার ছেলেমেয়ে নিয়ে
ঢ্যাংকুড়াকুড় ঢ্যাংকুড়াকুড়
বাজছে চারদিকে।

The Note of H

Aharshi Roy (ten-year-old)

A long time ago, there once lived a peasant. His name was Ren. He lived with his wife, Marry. He liked farming and had many friends who were also peasants. But he was very poor, poorer than the ordinary peasants. He was barely able to put food on the table. His friends wanted to help him, but he always refused. What he really wanted to do was to play the piano. He loved making music more than farming. Though the trouble was that he didn't have enough money to buy a piano. Every month with all his savings, he would go to the rich side of the town and rent a piano for an hour. He loved that magical hour at the end of each month. But that hour always seemed to turn into ten minutes.

One day, while working in the fields, he saw an old man approaching him. Ren had never seen that old man. Once the man was next to him, he started to talk. "You like playing piano, don't you?" Ren nodded. "Well, I have something to tell you. As you probably know, there are seven notes in the piano: A, B, C, D, E, F, and G. But there is another note called H. Bring a piano here at the same time tomorrow, and I will show you that. But beware! If too many people know this, very bad things would happen." Without saying another word, the man walked away. Ren walked back to his house while thinking hard. "Was there really a note called H?" After some time, Ren decided the man was not lying. But how would he get a piano? "I know. He only said if too many people knew. I could ask only one person for a piano." He decided that's what he would do. The next day, before work, Ren went to a person who had a piano. He explained what happened yesterday to the man. So, the man gave him the piano. He worked for some time in the fields. Then, when it was about time for the man to come, Ren got the piano. After waiting for what seemed like forever, the man finally came. Ren saw him holding what looked like a soggy orange lemon. "What's that?" Ren asked. "Oh, it's just a lemon stirred clockwise in a two-centimeter-thick plant pot filled with orange juice for a month." He said happily. "Now, I can't stay here for much longer so I will tell you what to do. You must put the lemon in any G note. Then once you play the note you will hear the note H." Then after that he walked away. Ren wished he could stay longer but it seemed like he would have to do it alone. He took the piano and the lemon and went back home. When he reached home, he did what he was told. Finally, the moment came. He pressed on the note of G. And nothing could have prepared him for what came next. The sound he heard was so beautiful, it could not be described in words. Ren's wife also heard the beautiful note, so she came to investigate. Ren decided it was also safe to tell her. Over the next few days, Ren decided to tell the secret to only his closest friends. But he got carried away and told all his friends. He also forgot to tell

them about not telling anyone else, so in less than a week, the entire nation knew. At that point, Ren decided that he wouldn't mind that warning about not saying it to anyone else.

Every day, he hosted big shows where he would play the note H, but he told nobody how to do it. Everyday flocks of people came to his town to hear the note of H. But just after he started to get used to being famous, strange things started happening to him. He was tripping everywhere, he was getting scammed, and all sorts of bad luck was happening to him. And it was getting worse every day. Finally, he realized that these were happening because he told too many people. So, he set out to the fields and waited for the man to come. And he did. "I see you found out what happens when you tell too many people." He spoke. Ren nodded. "Well," he continued, "Before you ask the question, I will give you an answer. To cure this, you must not play H for a week. And I advise you not to play it forever." And with that he walked away. Ren locked himself in his house for a week, and said he had an "illness". And while in the house he really got ill. Eventually, one week passed. Then he came out. It seemed as if everyone forgot about what he did. And no more bad things happened to him anymore. He decided he would not play the note H ever again. So, life was normal again. And best of all, because the man who lent him the piano forgot to take it back, Ren now had a piano.

The Staff of the Dead

Anush Roy (ten-year old)

Once there was a peasant, who was power-hungry. The only reason the peasant remained as a peasant was because nobody wanted to give him the responsibility of power. The name of this man was Rackle. Rackle did not have a wife or any children, for he disliked everyone. The person Rackle hated the most was a man named Homin. Homin was the exact opposite of Rackle. Homin was a proud, selfless, courageous, and helpful man and Homin never sought power. Homin lived in a hut on the East hill, facing Rackle's hut which was on the West hill.

Now Rackle and Homin were never on good terms with each other. Rackle hated Homin, and if there wasn't a river separating the lonely West hill from the bustling East hill which had the town, Rackle would probably try to beat up Homin.

It was early evening when Rackle was tending to his crops. In the distance he could see Homin's hut looming with huge fields behind it. The night before Homin and Rackle had a talk about making peace with each other. But Rackle hated Homin so much that he immediately disagreed and walked away without another word. As Rackle went back home he looked at the towering mountains in the distance. Rackle wondered if there were people like him in those mountains. Sighing, Rackle went inside his hut, shut the door, and laid on his bed. Due to his tiredness, he fell asleep immediately without another thought. When Rackle woke up, he went to his field and took the wheat bundle to sell at the town market. The closest bridge was a 4-mile walk and to get to the town walls was a 3-mile walk, which meant to go there and back it would take a 14-mile walk. As Rackle entered the town market he was not surprised that sweat drops were already making his clothes wet.

After Rackle sold his wheat, he went to the town square to take some rest. As Rackle sat down on the fountain at the town square, he found a map that was left on the stone of the fountain. There was something strange about it. It was full of writing. Rackle ran all the way to his house in astonishment! It was true, the staff of the dead was a true legend! The staff of the dead was a legend from long ago, back when there were many kingdoms with kings and queens. Back then the blacksmiths smithed the staff of the dead, which could make armies, fire lasers and many other spells. But the staff of the dead's best power was hidden in its name: the power of reviving dead, the one power mortal human desired. The legend was mostly considered false, but now… The map had writings that the staff of the dead was in a big mountain called Conerg. Though it would not help him because the map did not tell how to reach Conerg. Rackle wondered how the map came to him in the first place.

Soon he decided that he should get the staff of the dead from the mountain, for he felt a certain tug towards the staff of the dead. It was the next day when Rackle started his trek up to the mountain range. Only after climbing this mountain range, he can reach Conerg. At some point when Rackle was almost at the top of the mountain range, he looked back and saw the lamp-lit town twinkling in the distance. Rackle sighed, he was about to go over the clouds, and as he assumed, everything went foggy. Rackle was in a cloud. He had heard stories about being in clouds, but he had never felt it himself. Though after a few steps Rackle was over the clouds and could only see high mountains which were over the clouds. As he looked around, he saw a mountain higher than the others and he miraculously found a smooth path leading to it. But as Rackle looked at the path, it seemed to go inside the mountain not to the top of it. This is probably the entrance, Rackle thought as he examined the hard smooth rocky path in front of him in wonder. Though in a few seconds Rackle realized that the path was a 6-foot-wide bridge and about 20 feet long. Who made the bridge Rackle didn't know but he did wonder about it. Rackle cried in

astonishment as he looked at the map. The map recorded where he went, and it was making a dotted trail as he moved which winded down the mountain. Perhaps because he was power hungry, he was as calm as ever, though there was a rising excitement. As Rackle reached the cave he saw some roman numerals - XX VI. Rackle knew that these meant 20 and 6 but he didn't know what it meant. Suddenly he knew it, the bridge was 6 foot wide and 20 feet long! As Rackle went further he saw that there was a dead end. Desperate to find something, he searched the stone wall for something. Finally, he saw it, the stone doorknob! Without thinking, Rackle opened the door, unaware of what was inside. As the door opened, warm air came in. Rackle had entered a huge chamber, lit by many dim torches on the wall. Though the only thing Rackle paid interest in was the white light glowing brightly in the center of the enormous cave. As Rackle started to walk towards it, its white light seemed to get brighter and brighter until Rackle could see it clearly. The object was a staff which had a pure white crystal hovering on it. In short, it was the staff of the dead. As Rackle took the staff he looked at it greedily, it is now all mine, and I could now rule the world, Rackle thought as he took one last look at the cave and opened the door, now ready for the journey back.

Homin sighed as he looked at Rackle's house. Last night Rackle refused peace with Homin, and Homin felt hurt as Rackle walked away. Homin had just hoed his crops and was about to go into his hut. Homin's hut was a big one which was three times bigger than Rackle's hut. Homin had no wife because he was a hero and couldn't stand having children, for he would have to take care of them. Homin got in his bed and slept. The next day Homin woke up to see that it was dawn. Yawning, Homin got out of his hut and in his wooden carriage pulled by horses, set out for the village to sell the wheat. As Homin went to the village, he sold his wheat for $100 and went to talk with the townsfolk. While walking, Homin found 3 people in a conversation. "There's been talk that Conerg the mountain has been getting clearer." Said one person. "That's fake, Conerg is never clear!" Said another person, "What do you think Dopen?" "I think there is something fishy going on at Conerg." Dopen said thoughtfully. As Homin walked away from them, he thought there was something fishy going on with Conerg. Conerg indeed was becoming clearer than ever, which was not normal for there were usually snowstorms at Conerg every day. Homin walked home with $100 in his bag wondering: "Something was happening, and it had something to do with Conerg."

A few days later something big was coming from Conerg and it was using a single file line which was marching towards the town. As it got bigger the townsfolk saw that it was an army constructed by the staff of the dead. Immediately the horns sounded, and the archers got ready to shoot, while the cannons got ready to fire and the soldiers got ready to fight. Homin got woken up by the sound of horns. Without thinking Homin took his sword out and his shield and went running out of his house. What Homin saw was disaster. People were running around everywhere shouting "The gates were destroyed!" The battle went on for hours as more people of the kingdom came to fight the battle. Soon the entire army of the kingdom had come to fight this battle. Homin was fighting when he saw it, Rackle holding the staff of dead. Rackle saw Homin and said to the army of the staff of the dead: "Hold it! This one's mine!" Rackle said while pointing towards Homin. Rackle came to Homin and both became engaged in a legendary duel. Both of them did great hits and Rackle murmured many spells which caused Homin to get carried into the air, get hailed, and hit by an invisible fist. Then Homin did it. He stabbed the crystal with his sword and pushed Rackle back. For a moment, the crystal cracked, then it exploded with so much force, BOOM! What was left was a huge crater going down to the earth. Rackle looked at it and started crying and fell on the ground. Homin put his hand over Rackle and said, "It's okay" and Homin and Rackle went to Homin's house after a long day. Somehow, they now became friends. After the staff of the dead got destroyed, Rackle never let his hunger for power get in the way of their friendship.

PROUD TO SPONSOR MILONEE OF COLORADO

Ram V. Nathan Agency Inc.
Ramanathan Vaithianathan, Agent
9085 E Mineral Cir Ste 370
Centennial, CO 80112
(303) 799-0777
rvaithia@amfam.com

AMERICAN FAMILY INSURANCE®

American Family Mutual Insurance Company, S.I. & its Operating Companies,
American Family Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783 007251 – Rev. 1/17
©2017 – 19674139

রো-মানুষের গল্প

০০১ সাহিত্য সভা

অমিতাভ রক্ষিত, বৃহত্তর ডেনভার

সবুজ! চারিদিকে মসৃণ সবুজ! গাছপালা সবুজ, নরম ঘাস সবুজ, ভিজে মাটির ওপরে জমে থাকা শ্যাওলাও কত সবুজ! কেবল আকাশটা ঘন নীল, আর সামনের সরোবরের জলটাও অতি নিবিড়, শান্ত, নীল। আমার দুই শ্রান্ত মুশাফির চোখ, বিস্ময়ে লীন হয়ে গেল, অস্‌ফুট্ এক আনন্দে।

এ দৃশ্য আমি চোখে দেখিনি কোনদিন। আমাদের রোবটের রাজ্য! চারিদিক কেবল ধাতব্ রূপালি রঙ-এ মোড়া। ভোরে সূর্য ওঠার সময়টুকুতে শুধু, কিছুক্ষণের জন্য ফিকে লালের ছটা দেখা যায় এদিক ওদিক। কিন্তু আমার চা খেয়ে গ্রন্থাগারে যেতে যেতেই, সে রঙ আবার ধাতব হয়ে মিলিয়ে যায়।

লিপি গবেষকের কাজ করতে করতে গ্রন্থাগারেই একদিন আবিষ্কার করেছিলাম বহু পুরোনো এক নথি – অতি আদিম কালের, "কবিতা" বলে একধরণের লেখার একটি নিদর্শন। মাত্র আটলাইনের লেখা, পড়ে কিছু অনুভূতি হলো না! কেবল ওখানে "সবুজ" বলে একটা রঙের কথা বলা আছে, তাতে খুব আশ্চর্য্য হলাম – ওই রঙটা কোনদিন চোখে দেখিনি।

কম্পিউটারে গিয়ে দেখলাম "সবুজ" শব্দটার উল্লেখ আছে। একধরনের দূরপাল্লার ইচ্ছেজাহাজে, অন্যান্য ফ্যান্টাসি-গন্তব্যে যাবার বোতামের মধ্যে নাকি, "সবুজে নিয়ে যাও" বলেও একটা বোতাম আছে। কৌতুহলে তাই, সবুজে যাবার বোতামটা টিপেছিলাম একটা ইচ্ছেজাহাজ জোগাড় করে। তারপরে যে কতদিন কেটে গেছে জানা নেই। অবশেষে আজ এই জাহাজ এখানে এসে থামল।

ভয়ে ভয়ে সবুজ ঘাসের ওপরে পা ফেলে ডাইনে তাকিয়ে দেখি, বেশ কিছু লোকালয় আর বসতি। সামনের বাড়িটার দরজায় গিয়ে দুবার ধাক্কা দিলাম। স্মিতহাস্য এক প্রৌঢ় বেরিয়ে এসে বললেনঃ "খুব দরকারি কিছু ব্যাপার আছে কি? আমাদের এখানে এখন সাহিত্য সভা চলছে, গল্প-কবিতার আলোচনা হচ্ছে, বেশী কথা বলবার সময় নেই।"

==========

বাংলা সাহিত্যচর্চায় ইচ্ছুক ডেনভারবাসীরা 'সাহিত্য সভা'য় যোগদান করার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিজ দায়িত্বে যোগাযোগ করতে পারেন।

অমিতাভ রক্ষিত – arakshit2000@gmail.com

বি.দ্র. : 'সাহিত্য সভা'র সঙ্গে 'মিলনী'র কোন সংযোগ নেই। এই দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি সংস্থা।

কবিতা

এক ব্যর্থ রাজার গপ্প

অনন্য বন্দ্যোপাধ্যায়

এক যে ছিল মজার
দেশ, সুন্দর এবং
বিশাল, পাহাড় ও
অরণ্যে ভরা এক স্বপ্নের
মায়াজাল |

জীব জন্তু অনেক প্রকার, মানুষের নানান চাল,
সাদা কালো নিয়ে শোরগোল করে, এদিকে রক্ত লাল |
সেই দেশেতে মহারাজা বড়
দেমাক নিয়ে ঘোরেন,
সব ব্যাটারাই
মিথ্যেবাদী, শুধু তিনি
সত্যি জানেন |
শুরু হলো এক মহামারী, ডাক্তারগুলো সব গবেট,
এইটি মনে করে রাজা দেখতে গেলেন রকেট |

নাক ঢাকতে নারাজ যারা, সেই প্রজারা ভালো,
মরছে লোক লাখে তবু রাজা দেখেন আশার আলো |
ছিল এক বদ্যি, নাম ছিল তার ফৌচি,
সত্যি বলতে গিয়ে খেলেন রাজার কাছে ভেংচি |

এদিকে সাদা-কালো নিয়ে হয়ে যাচ্ছে রোজ চর্চা,
মহামারীর প্রকোপ দেখে বাড়ছে দেশের খরচা |

বন্দুকের নলের মুখে অসহায় দেশের অনেক শিশু,
রাজা বলেন বন্দুক রাখা তো অধিকার, এইটা কোনো ইস্যু |

সেই মজার দেশকে দেখে হাসছে আজ অনেক মানুষ,
এই দেশকেই না আদর্শ করে তৈরী হয়েছিল এক ফানুশ|

সেই দেশকে আদর্শ করে এগিয়ে ছিল যারা,
পারবে কি বাঁচাতে তাদের, যারা আজ সর্বহারা ||

Shohini Ghosh

I am the Key to the Home of your Dreams

Broker Associate, GRI, Realtor,SMART 2022
Coldwell Banker Realty

720-217-8516 email: shohini.ghosh@cbrealty.com

www.ShohiniSells.com

We are experts in roof replacement, hailstorm repair, and other types of roof repairs!

We also specialize in:

- Stucco
- Siding
- Windows
- Decks
- Painting
- Gutter
- Fire restoration
- Water restoration

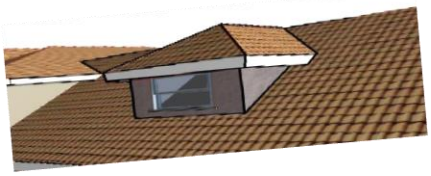

We can guarantee high standards and quality!

References available from the Indian/Bengali community!

Call us or email us now for all your home repair needs!

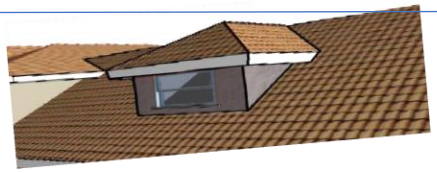

দ্বীপের নাম হাভার

অমিত নাগ

যাতায়াতের পথে মহিলাকে দেখেছি। আজ হেসে চোখের ইঙ্গিতে আহ্বান করে আমাদের ডাকলেন, হ্যালো, এদিকে আসবে একবার। সমুদ্রের ধারে চুনাপাথর বাঁধানো ছায়াঘেরা হাঁটা রাস্তার ধারে, একটা ছোট মতো জেটির প্রবেশের মুখটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন সবসময়। আজ এখনও আছেন। সামনে একটা টেবল স্ট্যান্ড আর একটা পুল আপ ব্যানার। তাতে নানান ওয়াটার স্পোর্টের দাম লেখা - বোটিং, ওয়াটার স্কি, সেল বোটিং, কায়াকিং। পেছনে মনমুগ্ধকর বিখ্যাত এ্যাড্রিয়াটিক সাগরের সবজে-নীল জল, তাতে সারিসারি মাস্তুলওলা ইয়ট, বোট আর বড় বড় ক্রুজ-শিপ। পোর্টে এসে নোঙ্গর ফেলেছে। যাত্রীবাহী ক্যাটামারানগুলো অন্যান্য জায়গা থেকে এসে ঘাটে ভিড়ছে এক এক করে। সমুদ্রপাড়ে পাহাড়ের ধাপে ধাপে পুরোনো গ্রীক রোমান স্টাইলের সাদা সাদা বাড়ী আর তাদের লাল লাল টালির ছাদ। চারিদিকে শুধু নীল, লাল আর সাদা আর মাঝেমাঝে গাছপালার সবুজের ভরাট। গরম নেই মোটেই, মৃদুমন্দ ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ। এসব দেখে মন ফুরফুরে হয়ে যেতে বাধ্য। লজ্জাশরম পকেটে পুরে ফেলতে পারলে দুহাত তুলে পাক দিয়ে দুচক্কর নেচে নেওয়াও যেতে পারে। বা গেয়ে নেওয়া যেতে পারে দুকলি গান। দ্বীপের নাম হাভার। এ্যাড্রিয়াটিক সাগরে ক্রোয়েশিয়ার মূল ভূখন্ডের তীরভূমির কাছে সাজানো গোছানো টুরিস্ট স্পট, এই জনপ্রিয় দ্বীপটি। গতকাল দুপুরে এসেছি ক্যাটামারানে আড়াই ঘন্টা সফর করে দুব্রোভনিক শহর থেকে। এসে ইস্তক মুগ্ধ। শহরের সবকিছুই এই হাভার পোর্টের আশেপাশে, পোর্টকে ঘিরে। রেস্টুরেন্ট দোকান মিউজিয়াম পার্ক সবই। একটু অবাক লাগছে। আমরা স্থানীয় বা আশেপাশের শ্বেতাঙ্গ নই, বিত্তবানের জেল্লা বা আদব কায়দার প্রকাশ নেই চালচলনে যে ধারণা হতে পারে দুম করে ওয়াটার স্পোর্ট সার্ভিস কিনে নেব খেলাচ্ছলে একটু দোনামনা না করেই। কিছু একটা করবো হয়তো সঙ্গে তরুণ ছেলে রয়েছে যখন। তবে সে আর পাঁচটা এরকম পরিষেবা দেখেশুনে দরদাম বুঝে। তাছাড়া এসে থেকে দেখছি এখানকার সেলসপারসনরা অন্য জায়গার মতো ট্যুরিস্টদের কিছু বিক্রি করার জন্য টানাটানি হাঁকাহাকি করেনা তেমন। শুধু দুএকটা রেস্টুরেন্ট থেকে ডাকাডাকি করেছিল - ইন্ডিয়া, মুম্বাই, দিল্লি এসব প্রশ্ন করে। ওসব হৃদয় দ্রব করা মধুর ডাক শুনে কেউ কেউ গলে গিয়ে ঢুকে পড়তে পারে বটে দোকান বা রেস্টুরেন্ট, কিন্ত আমরা ইন্ডিয়া থেকেও নই, দিল্লি মুম্বাই থেকে তো নয়ই। তার ওপর বোম্বেকে মুম্বাই শুনতে এখনো অভ্যস্ত হতে পারি নি। বিরক্তই লাগে বেশ কেন জানি মুম্বাই শুনলে। বোম্বে নামের ওজনই নেই ওতে। মেনে নিতে অসুবিধে হয়। অতএব গলে যাবার প্রশ্ন নেই। জেটির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা নরম সরম শান্ত মহিলার ডাক শুনে অবাকই লাগছিল বেশ। কি বলবে কে জানে!

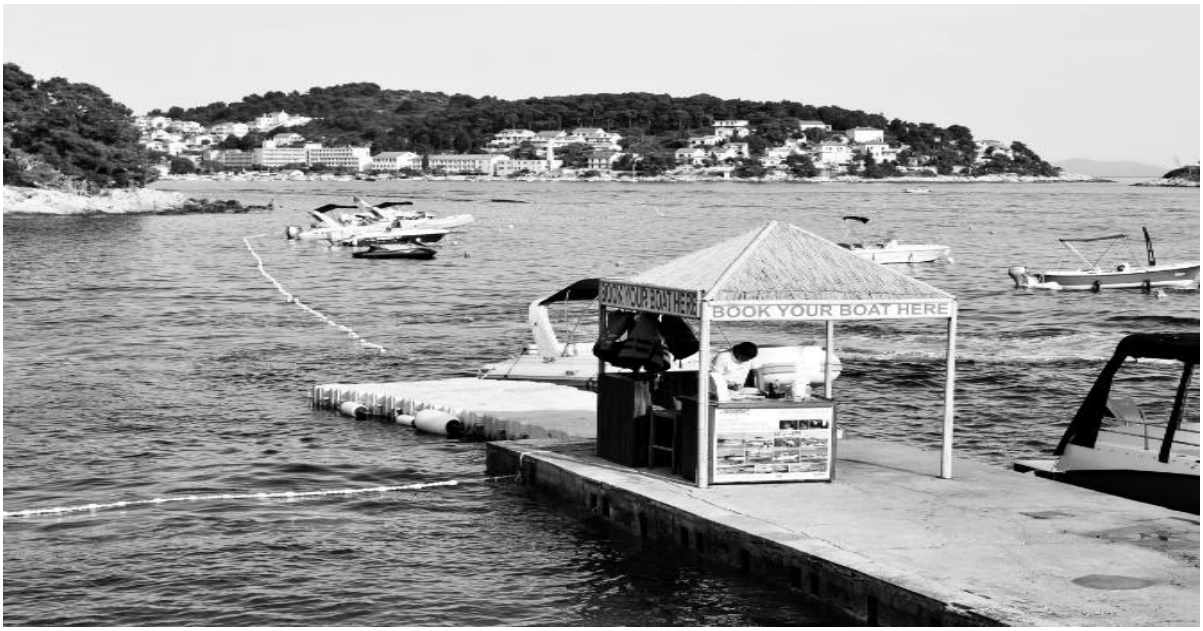

“তোমাদের কাল বিকেল থেকে দেখছি এখান দিয়ে হেঁটে যেতে। একটা কথা না বলে পারছি না। তোমাদের এই ছেলের চোখদুটো খুব সুন্দর । আমি খুব কমই দেখেছি এমন চোখ।” “হাও ওল্ড আর ইউ?” “আয় এ্যাম টোয়েন্টি,” ছেলে বলে। আমরা অবাক শুনে, তবে পুরোপুরি বিস্মিত নই একেবারে। ছোটবেলা থেকে এমন শুনেছি বার কয়েক। একবার এক পিডিয়াট্রিশিয়ান ডাক্তার মহিলা ওকে দেখেই বললেন, “মাই গড, হোয়াট আ ওয়েসট!” মানে, কি আবার নষ্ট হলো! ডাক্তার মহিলা ব্যাখ্যা করে বললেন ছেলেদের অত বড়বড় আইল্যাশ উনি নাকি দেখেননি কখনো। তাছাড়া অমন অ্যামন্ড বাদামের মতো শেপের চোখ। ওসব কোন মেয়ের হলেই নাকি বেশী কাজে লাগতো। মেয়েরা সুন্দর দেখতে হবে। ছেলেরা আগে হবে কর্মক্ষম, তারপর সুন্দর হলে আপত্তি নেই। যতই আধুনিক হোক না কেন, সব দেশেই এখনো মোটামুটি এরকমটাই আশা করে থাকা হয়। এনাফ অফ জেনডার ইকোয়ালিটি আর ডাইভার্সিটি।

মহিলা খুব মায়াময় কন্ঠে বলেন, “ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম। আয় এ্যাম সিঅর, ইউ আর নট হিয়ারিং ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম।” “এনজয় ইঅর স্টে এ্যাট হাভার।” একটাই হাঁটা পথ হোটেল থেকে বাজার রেস্টুরেন্ট ভরা পোর্ট এলাকায় আসার। আরও কতবার পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি। একবারও ভুল হয়নি তার হেসে তাকানোয়। তবে আবার থামালেন পরেরদিন বিকেলবেলায়। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হেসে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, “একটা কথা বলবো বলবো ভাবছিলাম।” ছেলেকে বললেন, ”তুমি তোমার ঐ সুন্দর চোখজোড়া সানগ্লাসে ঢেকে রেখো না প্লিস। কেউ দেখতে পাবে না।” টুকটাক কথা বলে হেসে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসি। একবারও বলেন নি ওনার ওয়াটার স্পোর্টস সার্ভিস কিনতে। আশ্চর্য! ছেলেকে মা হেসে বলে, “এই রে, মনে হয় তোর প্রেমে পড়ে গেছে! এবার কি হবে। আমরা তো কালই চলে যাবো।” ছেলে অবিশ্বাসী কন্ঠে বলে, “নট পসিবল্! শি ইস প্রোব্যাবলি ফর্টি, আয় এ্যাম টোয়েন্টি।” হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম একেবারেই কি হয় না। কাকে কার কখন ভালো লেগে যায়, কে কখন কার প্রেমে পড়বে তা কি বয়েসের বাঁধনে বাঁধা সম্ভব! আমাদের নিজেদেরই কি কখনো পনের-বিশ বছরের ছোট বা বড় মানুষকে ভালো লেগে যায় নি। ইচ্ছে হয়নি সেসব সুন্দর মানুষদের প্রেমে পড়ে যেতে! অন্য একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় একটু হেসে

উঠলাম নিজের মনে। অভিনেতা পরাণ বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে রজতাভ দত্তকে একবার বলতে শুনেছিলাম কোন এক ইন্টারভিউয়ে। পরাণবাবুকে ড্রেসিং রুমে যখন কোন অল্পবয়সী সুন্দরী নায়িকা মেক আপ শেষ করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতেন, পরাণদা কেমন দেখাচ্ছে আমাকে। উনি ভালো খারাপ কিছুই বলতেন না। এমন কি ওনার সেই পেটেন্ট ডায়ালগ, “ভালো, কিন্তু আরও ভালো হতে হবে,” -টাও নয়। তার বদলে বলতেন, “বড্ড দেরীতে জন্মালি যে!” আমাদেরও তো কখনো-সখনো মনে হয়েছে আরেকটু আগে বা পরে জন্মালেই যেন ভালো হতো।

হাঁটতে হাঁটতে এলোমেলো ভাবনারা ঘিরে ধরে। মেয়েটি হয়তো আটত্রিশ-চল্লিশ বছরের। শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধশ্রী সৌন্দর্যের হাল্কা ছটা চোখমুখ ঘিরে। হয়তো একা। সারাদিন কাজ শেষে ফিরে যায় নিজের ভাড়া করা সিঙ্গল রুমের স্টুডিও এপার্টমেন্টে। ইউরোপের বহু নাগরিকই দেখেছি ভাড়া বাড়ীতেই সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। কাজ, ভাড়ার এপার্টমেন্টে বাস, ডিপার্টমেন্ট স্টোরে রোজকার খরিদ্দারি, আর ছুটিছাটায় খানিক ভ্রমণ। টুকটাক রোজকার আটপৌরে বিসাসিতা বলতে কোন কোন দিন ফুল কিনে এনে ফুলদানির সাজিয়ে রাখা অথবা রাস্তার ধারে ক্যাফেতে বসে কফির সঙ্গে নিজের প্রিয় বই বা কাগজ পড়া আর মানুষ দেখা। সাধারণ মানুষের ছোটখাটো ইচ্ছে, সরল জীবন। তাদের মতো এও হয়তো ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে কেনা ফ্রিজে রাখা মাখন আর ব্রেড স্প্রেড বার করে বাগেটের টুকরোয় মাখিয়ে ডিনার সারতে বসে কাজের শেষে। অথবা আগের দিনের কেনা চাইনিজ দোকানের বেঁচে যাওয়া খাবার গরম করে খেতে বসে। ডিনার শেষে রেড ওয়াইন আর চিজের টুকরো নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসে ঘরের আলো কমিয়ে। পুরোনো রেকর্ড প্লেয়ার বা সিডি প্লেয়ারে চালিয়ে দেয় নিজের প্রিয় কোন সিম্ফনি বা গান। আজকের সময়ে নিজের স্মার্ট ফোন থেকেও চালাতে পারে ব্লু-টুথ স্পিকারে। জানলার ব্লাইন্ড উঠিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে খানিক। জাহাজে, বোটে, পোর্টের দোকান রেস্টুরেন্টগুলোয় আলো জ্বলে উঠেছে। আকাশে টিপটিপ করে জ্বলে উঠেছে তারারা। এই সমুদ্রের পাড়ে এই একঘেঁয়ে কাজ করতে করতে কত বছর কেটে গেলো। দিন আসে দিন যায়। স্বপ্নেরা সরে সরে যায়। এদেশ থেকে অনেকেই জার্মানী চলে যায় কাজের খোঁজে। বড় শহরে যাওয়ার স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেলো হয়তো।

তিনদিন হয়ে গেলো এই সুন্দর দ্বীপে। আজ যাবার সময় এসে গেছে। শেষ বিকেলে পোর্ট থেকে জাহাজ ছাড়বে। পরের গন্তব্য স্প্লিট। সেই জেটি, সেই টেবল স্ট্যান্ড আর পুল আপ ব্যানারের পাশ দিয়েই যেতে হবে জাহাজঘাটায়।

প্রতিদিনের মতো আজও একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। আমরা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারলাম না, বিদায় না জানিয়ে। কাছে এগিয়ে বললাম, আমাদের এখানে থাকার সময় শেষ, আজ চলে যাচ্ছি। আর হয়তো দেখা হবে না। ইট ওয়াস নাইস টু মিট ইউ। থ্যাংক ইউ ফর ইঅর কাইন্ড ওয়ার্ডস। স্টে ওয়েল। একটু কি নিভে গেল চোখের জ্যোতি। একটু কি ম্রিয়মাণ শোনাল কন্ঠস্বর। হয়তো শোনার ভুল। হয়তো আমাদের কল্পনা। বললো, "নাইস টু মিট ইউ টু। ভালো থেকো তোমরা।" আমাদের লাগেজগুলো টানতে একটু বেশী ভারী লাগছিল। দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এলেও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি এখনো। জাহাজ ভোঁ দিয়ে জানান দিচ্ছে বোর্ডিং শুরু হয়ে গেছে। যাত্রীরা সবাই যেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। সমুদ্র থেকে উঠে আসা জোলো হাওয়ায় একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। জাহাজের থেকে গলে বেরিয়ে আসা আলো জলের ঢেউয়ে পড়ে চিকমিক করে নাচছে ঢেউয়ের মাথায়। যেতে যেতে একমুহূর্তের জন্য থমকে ঘুরে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম দিনান্তের পড়ন্ত আলো মাখা ওয়াটার স্পোর্টের জেটিটার দিকে তাকিয়ে। সেই জেটি, তিন দিন ধরে সকাল বিকেল যার পাশ দিয়ে হেঁটে গেছি। আর অমনি অবাক কান্ড! কি আশ্চর্য সমাপতন। খেয়াল করলাম শুধু আমি একা নই। আমরা সবাই প্রায় একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েছি জেটিটা শেষবারের মতো দেখার জন্য। অথবা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা একজনের জন্য।

==========

চিত্রশিল্পী : *দীপিকা ঘোষ মৌলিক*

হাসির অন্তরালে

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

যে চরিত্রটি এখানে আমার উপজীব্য, এই শিরোনামটি তাঁর বিচিত্র আত্মজীবনীটি থেকে নেওয়া।

নাম : শ্রী নলিনীকান্ত সরকার (*28 Sept., 1889 - 18 May, 1984*)।

তাঁর প্রথম যৌবনকালে কিছু কিছু করে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ছাড়া যাত্রা-কীর্তন-বাউল, রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত-নীলকণ্ঠ, গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-রজনীকান্ত শিখে তিনি এলেন শান্তিনিকেতনে। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সহজেই 'দিন-দা' বলবার হৃদ্যতা স্থাপন করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে লাগলেন। কিন্তু প্রতি সপ্তাহান্তে কলকাতা-বোলপুর আসা-যাওয়া দেখে তাঁকে কবিগুরু একটানা একবছর থেকে পাঁচশ গান শিখে নেওয়ার জন্য বন্দোবস্ত করে দেবেন, বললেন। নলিনী তাঁকে আশ্চর্য হয়ে বললেন, তিনি এতগুলি গান শিখে কী করবেন! বিশ্বকবি বললেন, অন্য অনেকের মতো নলিনীও গানের স্কুল করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। নলিনী বলে বসলেন, গান শিখিয়ে রোজগার করার কথা তিনি ভাবতেও পারেন না। কবি তাঁর কাছে অন্যান্য পেশার উদাহরণ দিলেন, কিন্তু নলিনী গোঁ ধরে রইলেন। তবে তাঁর ভাগ্যবিধাতা গুরুদেবের কথা অমান্য করার শাস্তি দিয়েছিলেন। তাঁকে সেই গানকেই পেশা করতে হয়েছিল। তার থেকেই কিছু কিছু দেওয়া এখানে আমার উদ্দেশ্য।

তিনি লিখছেন, প্রথমে সাংবাদিকতাকে পেশা করে মনের আনন্দে গান গাইতেন। তবে সেই গানে 'কোকিলের কূজন ছিল না'; ছিল দ্বাদশ অশ্বশক্তি সম্পন্ন জলদের নির্ঘোষ। সে যুগে মাইক ছিল না, তাই তাঁর এই ক্ষমতা জনসভায় 'অ-মায়িক' গান পরিবেশনে সাহায্য করত। কিন্তু গান গেয়ে কেবল বাহবা পাওয়ার স্বাদ যে কিরকম, তার মর্মবোধ হলো একবার বন্ধুর অনুরোধে কলকাতার সুদূর প্রান্ত সাহানগরে গিয়ে। সম্বল একটি টাকা নিয়ে বৌবাজার থেকে ট্রামে রওনা হয়ে বহু খোঁজাখুঁজির পর ঠিকানায় পৌঁছলেন। সেখানে বেশ জনসমাগম তাঁর গান শুনতে। ঘণ্টা তিনেক বিচিত্রপ্রকার গান তিনি গাইলেন। শ্রোতারাও সমঝদার। রাত ১১টায় গান শেষ করে তিনি বেরিয়ে দেখলেন শেষ ট্রাম চলে গেছে। খাওয়া দাওয়াও ছিল না। তাঁকে ছাড়তে আসা সঙ্গীরা কেবল বলছেন 'আপনি একটি জীনিয়াস'। তাঁরা আবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ট্যাক্সি ডেকে তাঁকে তাতে উঠিয়ে দিয়ে আবার 'আপনি একটি জীনিয়াস' বলে বিদায় নিলেন। এদিকে 'জীনিয়াস'-এর পকেটে তখন একটি টাকাও নেই। বাড়িতেও 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। ট্যাক্সি তখন রসা রোড দিয়ে, নাকি তাঁর হৃদপিণ্ডের উপর দিয়ে চলছে, সে বোধ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। ট্যাক্সিকে আট আনা আক্কেল-সেলামী দিয়ে রাত-দুপুরে ভবানীপুর থেকে বৌবাজার- পদব্রজে 'জীনিয়াস'-এর জয়যাত্রা!

তাঁর পরিচিতির পরিধি ছিল বিপুল। যেন বর্ণালীর সাতটি রঙই ছুঁয়ে গেছিল। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে কে নয়! অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কর্তৃপক্ষ থেকে শিল্পীরা, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশিষ্টজন, বিপ্লবীগোষ্ঠী, দেনদার-পাওনাদার, স্বনামধন্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, সবাকচিত্রনির্মাতা, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, কোলিয়ারীর অধিকারী, কাজি নজরুল, বার এ্যাসোসিয়েশন, ঘর-জামাই (তাঁর বিদ্রূপাক্রান্ত), কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ব্রাহ্মসমাজের নব্য মহিলা, গুরুসদয় দত্ত, জলধর সেন, বৃটিশ কর্তৃক পদলোভী জমিদার, অহীন্দ্র চৌধুরী, সজনীকান্ত দাশ, অমল হোম, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, শচীন দেব বর্মন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি, হাতির পিঠে সওয়ার বাঘ-শিকারী, জাঁদরেল পুলিশ ইন্সপেক্টার, 'ভারতী' পত্রিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডাধারী... সবচাইতে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল শরৎচন্দ্র পণ্ডিত-যিনি 'দাদাঠাকুর' বলে বাংলার এমন একজন বিশিষ্ট চরিত্র- যাঁর তুলনা হয় না। নলিনীবাবু তাঁর জীবনী লিখেছিলেন। যেটি দা-ঠাকুরের জীবৎকালেই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস। যে ছবিটি যে বাঙালী দেখে নি, তার জীবন বৃথা।

জীবনযুদ্ধে অর্থোপার্জনের উপায় না খুঁজে পেয়ে শেষ পর্যন্ত নলিনীবাবু সঙ্গীতশিক্ষক ও হাস্যকৌতুক গানের গায়ক- এই জীবিকা বেছে নিয়েছিলেন। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে উপস্থিত তাঁর এই "হাসির অন্তরালে"।

কবিতা

তাপ রাক্ষস

অনিন্দ্য বসু

রোদ্দুরে কদ্দুর যাওয়া যায় বলো?
গনগনে চাদ্দিক ছায়া দিয়ে চলো।
নদী-বিল ঝিল যতো
শুকিয়েছে কতো শত
ধরা তলে খরা চলে
জনহীন পথও!

আকাশেতে মেঘ কই?
চাতক খুঁজছে ঐ
ফটিক জলের তরে কাঁদে বেচারা!
কত প্রাণ দাবদাহে হলো যে সারা।

সময় নেই যে এসো সকলে মিলি
পৃথিবীর তাপাঙ্ক কমিয়ে ফেলি

বিদ্যুত ব্যবহার মেপে করো আর
মোটর চেপোনা যেথা-সেথা বারবার

জীবাশ্ম জ্বালানি কম জ্বলে যেন
আর কিছু না পারো তো এইটুকু মেনো

পৃথ্বী শীতল হলে রবে বাসযোগ্য
দ্বিতীয় প্রজন্মের সকলের ভোগ্য

সবাই নিইনা কেন একটি শপথ
বিজ্ঞানী যা বলেন সেই ঠিক পথ
সেই পথে চললেই ছায়া পাবে কায়া
অজর অমর রবে জগতের মায়া।

বাঁশি

গার্গী ভট্টাচার্য

একটা ধ্বনি – অন্যটাও, শব্দ হলো,
শব্দ বুনে এদিক ওদিক
অনেক কথা।
এদিক সেদিক অনেক কথা ছড়িয়ে পড়ে।
প্রতিধ্বনি পরিশেষে নীরবতা।

ভাঙা ঘরের দেওয়াল জুড়ে অশ্বত্থ গাছ,
বেড়ে ওঠে শিকড় ছড়ায় ইতস্তত,
একটা ফাটল, দুটো ফাটল,
ভাঙন বাড়ে।
পোড়োবাড়ির পুরনো গায়ে নতুন ক্ষত।

শূন্য থেকে সংখ্যাগুলোর যাত্রা শুরু।
একের পরে এক লাগিয়ে আগে বাড়া,
যোগ বিয়োগ আর ভাগের পালা
সাঙ্গ করে,
শূন্য দিয়ে গুণ করে তাই শূন্যে ফেরা।

নীরবতার পরে আবার একটা ধ্বনি
অন্যটাকে ডেকে নিয়ে শব্দ সাজায়।
অশথ গাছের তলায় বসে
একলা ছেলে-
শূন্য দিয়ে গুণ করে সব বাঁশি বাজায়।

বিনোদন : শহর থেকে শহর

পেটপুজো @ কলকাতা

মৌ পাল ও অভিষেক রায় (কলকাতা)

চলুন, আজ আমরা একটু দক্ষিণ কলকাতার খাদ্যসরণি বেয়ে ঘুরে আসি। প্রথমেই সকালের জলখাবারের জন্য যাওয়া যাক হাজরার বিখ্যাত 'শর্মার কচুরির দোকান'-এ। ভোরের হালকা বাতাস আর তার সাথে ফুলকো কচুরি আর ধোঁয়া ওঠা আলুর তরকারি – তার আমেজই আলাদা। এর সাথে একগ্লাস ঘন সর দেওয়া লস্যি আর গরম গুলাবজামুন নিতে ভুলবেন না কিন্তু। ফেরার পথে হয়ে যাক পি জি হসপিটাল এর সামনে 'গুরদোয়ারা'-র মাটির ভাঁড়ে ঘন দুধের মালাই চা। আর তারপর গোলপার্ক-এ 'বাঞ্ছারাম'-এর সুস্বাদু, মুখে দিলে গলে যায় এরকম নরম কাঁচাগোল্লা দিয়ে সকালের পর্বের সমাপ্তি।

এরপর দুপুরের খাওয়ার জন্য গন্তব্যস্থল পার্কসার্কাস-এর সেই দোকানটি, যেটি ছাড়া আজকাল কলকাতার যেকোনো খাদ্য বিষয়ক লেখা অসম্পূর্ণ। হ্যাঁ, 'আরসালান'-এর কথাই বলছি। মাটন বিরিয়ানি স্পেশাল তো নেবেন-ই। সাথে মাটন ষ্টু আর ফিশ কাবাব নিয়ে দেখতে পারেন। বুঝতে পারবেন শুধু বিরিয়ানি না, অন্যান্য আইটেম-এও 'আরসালান' অনন্য।

দুপুরের ভুরিভোজের পর যদিও মনে হবে যে রাতের ডিনার অবধি বন্ধ, তবু কলকাতার জল-হাওয়া তো! বিকেল হতে না হতে-ই কলকাতার স্ট্রীট ফুড আপনাকে ডাকতে থাকবে। প্রথমে শরত বোস রোড-এর 'আপনজন'-এর বিখ্যাত ফিশ ফ্রাই আর মাটন–ডিমের ডেভিল। তারপর একটু মন কেমন করে উঠবে রোল-এর জন্য। এই একটি জিনিস তো বিকেলের জলখাবারে মাস্ট। চলে যাওয়া যাক রাতের রানী পার্ক স্ট্রীট-এ। সেখানে 'কুসুম'-এর এগ-মাটন রোল খেয়ে মনে হবে "সার্থক এ-জনম"! কলকাতার খাদ্যতালিকায় ইন্দো-চাইনিজ ফুড তো থাকতেই হবে। আর পার্ক স্ট্রীট-এর 'বারবিকিউ' তো সেই লিস্ট-এর একদম উপরে থাকবে। প্রথমে নেবেন সুইট কর্ণ চিকেন সুপ আর ফিস ফিঙ্গার, সাথে ফ্রেশ লাইম উইথ সোডা। তারপর মিক্স ফ্রায়েড রাইস, হট এন্ড গারলিক কিং প্রণ, হাক্কা চিকেন চাওমিন আর চিলি চিকেন ড্রাই উইথ বোন। দিল একেবারে গার্ডেন গার্ডেন হয়ে যাবে! রাতে যখন বাড়ি ফিরছেন, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে যেকোনো স্টল থেকে একটা মিঠে পান নিয়ে নেবেন। পানের সুবাস আর সারাদিনের সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে মনে হবে

"আমার শহর এ কলকাতা
মায়ার শহর কলকাতা
হারিয়ে সব জীবনের পথ
ফেরার শহর কলকাতা।"

Laxmi Foods

Address

2705 S. Parker Road, Aurora, CO-80014

(Same Parking lot of H-Mart, opposite side)

Store Phone: 303-751-5050

Laxmi Kafley (Krishna): 502-510-4124

We are an International Market with Indian, Bangladeshi, South Asian Groceries and Spices, specializing in

Halal Meats,

Fish (Bengalis) and

Fresh vegetables

Katari Bhog Rice

Baghabari Ghee

Radhuni Masala

Haldiram / Nanak / Deep products and more

Also Available fresh and best quality groceries like

Atta, Rice, Dal, Spices, Masala, Pickles, Ghee, frozen ready meals and many more.

বিনোদন : শহর থেকে শহর

পেটপুজো @ কলোরাডো

*অম্বরীশ নাগ (**অনুলেখন** : বিপাশা ভট্টাচার্য)*

কথায় বলে, 'রসে বসে বাঙালি।" মানুষ হিসেবে তার যত বৈচিত্র্যই থাক না কেন, এই একটি বিষয়ে আপামর বাঙালির মধ্যে ঐক্য এসে ধরা দেবেই। খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসায় বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। দেশে হোক কি বিদেশে, স্বগৃহে হোক কি কোথাও বেড়াতে গিয়ে; বাঙালি নিজের রসনাতৃপ্তির সর্বোত্তম স্থানটি ঠিকই খুঁজে নেয়।

আমরা যারা নিজেদের বেড়ে ওঠার জায়গা থেকে বহুদূরে, এই সুদূর প্রবাসের অধিবাসী; তাদের জন্য রইল ডেনভারের বিভিন্ন বিখ্যাত ও অখ্যাত; অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন রেস্তোরাঁর সন্ধান।

নতুন ধরণের খাবার, নতুন কোন পদ, কিংবা নতুন কোন ক্যুইজিন চেখে দেখতে যারা ভালবাসেন, সেইসব এক্সপেরিমেন্টাল খাদ্যপ্রেমীদের জন্য এই শহরে রয়েছে একাধিক অপশনস। মেক্সিকান, ইটালিয়ান, কোরিয়ান, জাপানিজ কিংবা এশিয়ান খাবারের সম্ভার– কি নেই এখানে!

- অথেনটিক মেক্সিকান খাবারের অন্যমত সেরা ঠিকানা অরোরায় অবস্থিত 'Guadalajara Authentic Mexican Buffet' রেস্তোরাঁ।
- Dine in -এর মতো সময় সুযোগ সবসময়ে সত্যিই থাকে না। সেক্ষেত্রে Santiago's হতে পারে আপনার মনের মতো পছন্দ। ডেনভারে এদের অনেকগুলি শাখা আছে। আর তার মধ্যে বেশিরভাগই take out এর সুবিধাযুক্ত। স্বল্প বাজেটে আপনি পেয়ে যাবেন অত্যন্ত সুস্বাদু মেক্সিকান খাবার।
- ইটালিয়ান খাবারের স্বাদ নিতে হলে পৌঁছে যেতে পারেন 'Cinzzetti's'-এ। নর্থগ্লেন-এর এই ইটালিয়ান বাফে রেস্তোরাঁটিতে পেয়ে যাবেন অসাধারণ সব স্যালাড, হরেকরকম পিৎজা, ফ্রেশ ক্রেপস এবং আরও নানান রকমারি সব সুস্বাদু ইটালিয়ান পদ।
- কোরিয়ান খাবার পছন্দ হলে আপনাকে যেতেই হবে অরোরার 'Seoul Korean BBQ' তে। এই রেস্তোরাঁর নানান রকম কোরিয়ান ডিশ নিঃসন্দেহে আপনার উদর ও মন দুইয়েরই পরিতৃপ্তি ঘটাবে।
- জাপানিজ খাবারের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা পেতে চাইলে ঘুরে আসতে পারেন 'Sushi Katsu' থেকে। আপনার আশেপাশে, ডেনভারের অধিকাংশ মেট্রো এরিয়াতেই এর অনেকগুলি শাখা রয়েছে। আর এখানে সারাবছরই বিভিন্নরকম ডিল চলে। নিজের নিকটবর্তী শাখাটি এবং নিজের পছন্দসই ডিল খুঁজে নিয়ে এই রেস্তোরাঁর খাদ্যসম্ভারের স্বাদ নিয়ে আসতেই পারেন।
- সামুদ্রিক খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে হলে, ডেনভারের ফেডারাল-আলামেডা ক্রসিং-এর কাছে 'Empress Seafood restaurant'-এ একবার ঢুঁ মারতেই পারেন। এখানে এলে এদের 'ডিম-সাম' চেখে যেতে ভুলবেন না যেন! এই রেস্তোরাঁর ডিম-সাম কিন্তু ডেনভারের খাদ্যপ্রেমীদের তালিকায় অন্যতম সেরা হিসেবে বিখ্যাত!
- ফেডারাল-আলামেডা ক্রসিং-এর কাছেই, 'Star Kitchen' নামের আর একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। এদের ডিম-সাম-ও খুবই সুস্বাদু এবং উপাদেয় বলে বিবেচিত।
- এশিয়ান খাবারের জন্য ভোজনরসিকদের প্রিয় ঠিকানা হিসেব ডেনভারে অনেকগুলি জায়গা আছে। তাদের মধ্যে বিশেষত 'Aki Asian Hot Pot'-এর নাম না করলেই নয়।

- থাই খাবারের জন্য যে দু'টি রেস্তোরাঁর নাম প্রথমেই উঠে আসে, তা হল 'Thai Flavor' এবং 'Bua Thai'। এই দু'টি রেস্তোরাঁই পাবেন অরোরায়।

দেশের বাইরে থাকছেন বলে কি দেশের খাবারের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন? মোটেই নয়! কলোরাডোর বুকে একাধিক রেস্তোরাঁ নিখাদ ভারতীয় খাদ্যের সম্ভার নিয়ে আপনারই জন্য অপেক্ষমান। এখানে ইন্ডিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন ঘরানার কিছু বিখ্যাত ও জনপ্রিয় রেস্তোরাঁর সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করছি।

- সপ্তাহান্তে বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সঙ্গে নিখাদ ভারতীয় খানায় মজতে চাইলে চলে আসুন 'Hyderabad House'-এ। এখানের বিশেষত্বই হল সপ্তাহান্তের এই weekend buffet. পকেটকে দুঃখ না দিয়ে ডেনভারের অন্যতম সেরা বিরিয়ানি উপভোগ করতে চাইলে এখানে আসতেই হবে।
- 'Persis Indian Grill'-এর লাল মাস এবং গোট দম বিরিয়ানি হল সবথেকে উল্লেখযোগ্য এবং বিখ্যাত। একবার এর স্বাদ পেলে আপনি বারবার এখানে হানা দিতে বাধ্য।
- বিভিন্ন সুস্বাদু ভারতীয় খাবারের প্রচুর, প্রচুর ভ্যারাইটি সহ সুবিশাল মেনু, এবং খুবই ভাল গুণমানের খাবারের জন্য যাওয়া যেতে পারে 'Godavari'-তে। খাবারের পাশাপাশি নিখাদ ভারতীয়, গ্রাম্য ঘরানার আঙ্গিকে সাজানো অন্দরসজ্জা আপনার নান্দনিক রুচিকেও খোরাক জোগাবে।
- দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের জন্য গ্রিনউড ভিলেজের 'Garnish Fusion' খুবই ভাল পছন্দ। কন্থু পারাঠা ও রকমারি আমিষ দোসাগুলি এখানকার বিশেষত্ব। তবে অন্যান্য ভারতীয় রেস্তোরাঁর থেকে এটি সামান্য বেশি ব্যয়সাপেক্ষ।
- ডেনভারে বিরিয়ানি এবং দক্ষিণী খাবারের জন্য 'Bawarchi Indian Cuisine' নিঃসন্দেহে সব থেকে বেশি জনপ্রিয়।

দেশি, বিদেশি যেকোনো কুইজিনই হোক না কেন, খাদ্যরসিক বাঙালির কাছে সব থেকে বেশি প্রাধান্য পায় খাবারের স্বাদ, গন্ধ এবং গুণমান। কলোরাডোর বুকে নানান ধরণের, রকমারি খানার যে বিপুল বৈচিত্র্য বর্তমান, তা যেকোনো ভোজনরসিক মানুষের কাছেই এক দুর্দমনীয় আকর্ষণের বিষয় হতে বাধ্য।

ফিচার

Unite to Uplift and Surabhi Mehrotra – when communities join hands

Gargi Bhattacharya

Surabhi Mehrotra, or as everyone lovingly calls her Sue, was already working on community outreach and corporate social responsibility in India prior to moving to the US in 2008. As every immigrant family knows it is a huge task to resettle in a new culture facing new challenges and Sue's transition was no exception either. Sue is someone who faces challenges headlong. So, when she met those challenges here, like finding her own community, finding adequate support system as immigrant parents for their children, she started actively looking for solutions. Initially it was through participating in different one-off community events and in corporate community outreach events.

However, it wasn't until 2017 when Sue was out on her maternity leave, expecting her second child that she met the right opportunity. She came across this post from a local high school inviting help to run a food drive for homeless and food insecure children. Sue responded to the post and started volunteering for them, pulling in her friends in the community in the process, and in the last three months of 2017, Unite to Uplift was born as mostly a community owned and operated social organization helping schools with food and backpack drives. Sue's prior experience with community organization and community outreach and her innate desire to help people soon took over and she started thinking of ways of sustainably helping these children instead of one-off food drives or supply helps. Expanding the scope of Unite to Uplift, Sue began to organize and volunteer in other areas like career support, STEM careers, and overall attempts to increase cultural diversity and awareness in these US schools with speaking engagements and other supports. She narrowed the organization's focus to address immigrant issues in education. In May 2020, during the prime of Covid, 'Unite to Uplift' was registered as its own independent non-profit entity, volunteering with schools across Douglas, Jefferson, and Arapahoe Counties in supporting immigrants and under privileged children in many ways, including English classes for immigrant parents.

This year Milonee came together with 'Unite to Uplift' to support in some of their community efforts, including refugee re-settlement and backpack drive. As we gear up towards Bengali community's biggest celebration, Durga Puja, we had to shine a spotlight on the amazing Surabhu Mehrotra and labor of love 'Unite to Uplift'. If you want to volunteer your time, money, or resources, or simply want to know more about this amazing community organization, see the link below.

www.unite2uplift.org

They also have a Facebook presence where they announce the different drives and support initiatives they are running at the same time.

https://www.facebook.com/groups/1883084228651313/

Soft-spoken but determined, Sue became the change she wanted to see in this world!

চিত্রশিল্পী : *দীপিকা ঘোষ মৌলিক*

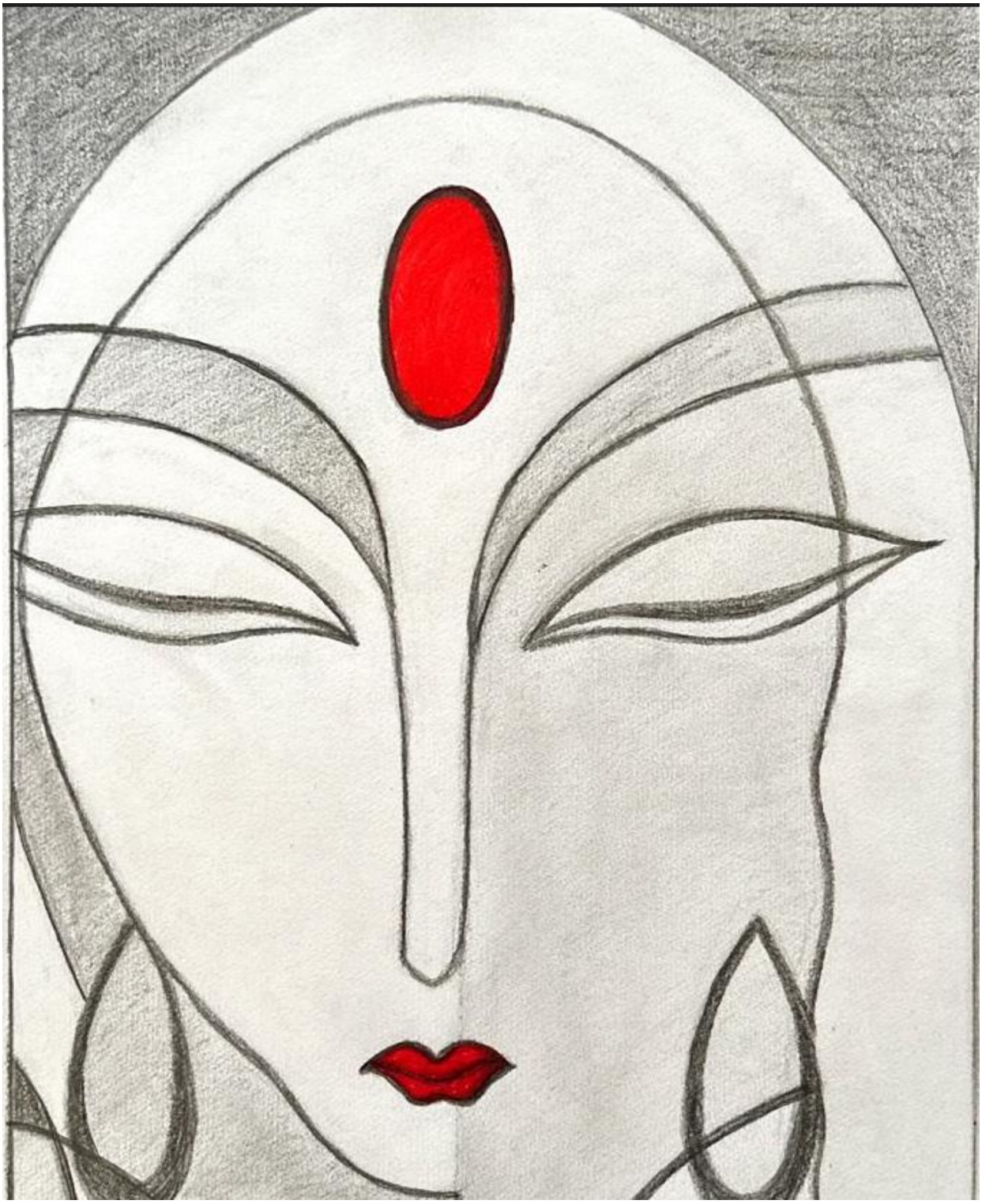

না বলা বাণীর

শুভা আঢ্য (অস্টিন)

উনিশ তলার বারান্দাতে ভোরের কাঁচা সোনার মতো রোদ, টবের সতেজ সবুজ গন্ধরাজ আর বেল ফুলের গাছের মধ্যে লুকোচুরি খেলে। কোথা থেকে একটা অচেনা লাল ঠোঁটের ছোট্ট কালচে-খয়েরি পাখি বারান্দার রেলিং-এর ওপর একটু বসেই, কে জানে কিসের ডাকে, ছোট্ট দুটি ডানা ছড়িয়ে কোথায় উধাও হয়ে যায়। দুটো বহুতল বাড়ির মাঝখানে এক-টুকরো আকাশ। তৃণা বেতের চেয়ারে বসে রোজই এইসময়ে ওই একলা আকাশটাকে দেখতে থাকে। আকাশটার এক-একসময়ে এক-এক রূপ। আজ এখন এই ভোরের সূর্যের আলোয় একটুকরো খুশির হাসির মতো ছড়িয়ে আছে, আবার মেঘলা দিনে ওকেই লাগে যেন কোন মনকেমন করা গহন বনের অজানা পথ। আবার কখনো গভীর রাতে তারার চুমকি দেওয়া একফালি নীল ওড়নায় নিজেকে সাজায়,পরীর মতো। তৃণার একলা, নিস্তরঙ্গ জীবনে ওই আকাশটাই অনেকদিনের সেই চেনা বন্ধুর মতো| পুরনো দিনের প্রায় ভুলে যাওয়া অনেক কথা তৃণা ওর কাছে বলতে পারে। ও চুপচাপ শোনে, বাধা দেয়না, বিরক্ত হয়না, কোনো প্রশ্নও করে না। তাই ওর কাছেই তৃণা সব কথা বলে। তৃণার যে আলাদা করে কোনো কথা থাকতে পারে সে কথা ওর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ ভাবতে পারেনা। সবার কাছে, তৃণা তো সেই চিরকালের চেনা- তিন্নি, বৌদি, মা, জেঠি, কাকি, দিদা, এই সব পরিচয়েই চেনা।

শুধু এই আকাশটাই ওকে 'তৃণা' বলেই জানে। সেই যে অনেক স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া একটা মেয়ে যে নিজেও কোনদিন কারো কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়নি বা পারেনি । সেই যে 'তৃণা', যে সারা দিনের নানা ব্যস্ততায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে ভাবতো, পুরনো দিনের কথাগুলোও সেই ব্যস্ততার গভীরে তলিয়ে যাবে, আর আসবে না তার মনে, স্বপ্নে কিংবা একেবারে একলা থাকার নিঃশব্দ নিরালাতে। কিন্তু পুরনো দিনগুলোর স্মৃতিরা মনের গহনে টিপটিপ করে তারার মতো জ্বলতে থাকে, ওরা তাকে ডাক দেয়, ভোরের শান্ত প্রহরে, সন্ধ্যার নিভন্ত আলোয়, নিশীথ রাতের গভীর অন্ধকারে। তারা মনে এনে দেয় সেই অনেকদিন হলো হারিয়ে যাওয়া এক ঝাঁক ছবির।

বারান্দার দরজা খুলে নিঃশব্দ পায়ে চায়ের ট্রে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় পার্বতী, তৃণার একমাত্র সঙ্গী ও সেবিকা। সুদূর আসামের এক অখ্যাত গ্রামের মেয়ে কেমন করে একদিন এসে পৌঁছেছিলো তৃণার সংসারে। ধীরে ধীরে সে হয়ে উঠেছিল তৃণার পরম বন্ধু, আশ্রয় আর সবকিছুর নির্বাক সাক্ষী। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে সে তৃণার পাশে পাশে ছায়ার মতো থেকেছে। দেখেছে তৃণাকে একটু একটু করে সংসারের সব দাবিতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। পার্বতী জানে তৃণার মনের গভীরে লুকিয়ে আছে কোনও একটি কথা, যা সে কারো সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেনি। ছোট্ট টেবিলে ট্রে রেখে একটু দাঁড়ায়, তারপর তৃণার কাঁধের গরম চাদরটা আর একটু তুলে দিয়ে ধীর পায়ে চলে যায়।

হিসেব করতে হলে সে বহুদিনের কথা, কিন্তু মনে হয় যেন এই তো সেদিন! আকাশকে প্রশ্ন করে তৃণা, - "সে যে থাকবে এই প্রতিশ্রুতিই কি দেওয়া ছিল না? মনের একান্তে যার ছিল নিরন্তর যাওয়া আসা, সে কেন এক বন্ধ দরজার ওপারে অচেনার মতো চিরদিনের জন্য থেমে গেল? - কেন?" নিরুত্তর আকাশ চেয়ে থাকে তৃণার দিকে, ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া তার কপালে বন্ধুর মতো ঠান্ডা হওয়ার ছোঁয়া দিয়ে যায়।

এমনি একটা প্রশ্ন করেছিল তৃণা আমাকেও, যখন ওকে হঠাৎ অনেকদিন পরে খুঁজে পেয়েছিলাম, কলকাতার দক্ষিণাপণের একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে। একাই ছিল। আমাকে দেখে একটুও অবাক হলো বলে মনে হলো না। হাতটা জড়িয়ে ধরে শুধু বলল, - "আয়, বোস।" – যেন রোজই আমাদের দেখা হয়! একটু পরে তৃণা স্বগতোক্তির মতো বলে, - "আমরা কে কোথায়, দূরে দূরে হারিয়ে গেলাম বলতো?" জিজ্ঞেস করলাম, "তুই কোথায় ছিলি, কোথায় আছিস, এতদিন তোর কোনও খোঁজই পাইনি।" তৃণা আমার কথার উত্তর না দিয়ে বলল, - "চল আমার সঙ্গে চল - তোকে কত কথা বলার আছে।" ওকে কথা দিয়ে বললাম, "আজ না রে, কাল তোর কাছে আসবো, আমারও যে কত কথা আছে তোর সঙ্গে!" চলে আসবার সময় বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল, - "আবার হারিয়ে যাস না যেন!

আমার মনে তখন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো হাজার প্রশ্নের ঢেউ উথালপাথাল করে উঠছে; কিন্তু তৃণা সেই যে আমার হাতটা ধরে আছে, তার আর কোনও সম্বিত আছে বলে মনে হচ্ছিলো না।

সেদিন ওকে ছেড়ে আসার আগে কথা দিয়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করার। তবে কেবলই মনে হচ্ছিলো, এ কোন তৃণাকে আজ ছেড়ে এলাম! আমার চেনা সেই উজ্জ্বল ভোরের মতো তৃণা, প্রাণময়ী তৃণা কোথায় গেল? এই আসন্ন সন্ধ্যার মতো স্তব্ধ তৃণা তো আমার চেনা নয়!

এবার বেশ কিছু বছর পিছিয়ে যাই।

তৃণা আর আমি, দু'জনেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম, সেই নিতান্ত কচি বেলায়। শ্রীসদনের লম্বা ঘরে সারি সারি মশারি টাঙানো খাট, তাতে ছোট ছোট মেয়েদের আস্তানা। আমার আর তৃণার খাট ছিল পাশাপাশি। ভাব হয়ে গিয়েছিল সহজেই। প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসেই আমাদের দেখা হয়েছিল ছোট্ট কৌশিকের সঙ্গে। আমি আর তৃণা নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়ে এসে ছাত্রাবাসের বাসিন্দা। কৌশিক থাকতো তার মাসির কাছে। কৌশিকের বাড়িতে নির্দ্বিধায় যাতায়াত করতাম, মাসিমার হাতের নাড়ুটা,মোয়াটা পাবার লোভে। কৌশিককে আমাদের দলে নিতে কোনোই বাধা ছিলনা। দেখতে দেখতে আমরা হয়ে উঠেছিলাম অবিচ্ছেদ্য বা অন্যদের আখ্যায় 'তিন মূর্তি'।

এমনিতে কোথাও কোনো মিল ছিলোনা আমাদের। তৃণা ছিল শান্ত, আমি দুরন্ত। তৃণার সবকিছুই গোছানো, পরিপাটি, আমার অগোছালো,ছত্রাকার! তৃণা মন দিয়ে শেখে গান, পায়ে নূপুরের ছন্দ তোলে নাচের ক্লাসে। আমি সে সময় গাছে গাছে বিচরণ করার কলা অর্জন করি। তার ফলে আমার হাঁটুতে পার্মানেন্ট ব্যান্ডেজ! হোস্টেলের বড় দিদিমণির কাছে তৃণা লক্ষ্মী, আমি দস্যি। তবু আমাদের বন্ধুত্বে কোনো ফাটল ধরেনি কখনো। সে হয়ে উঠেছিল আমার প্রাণের বন্ধু। আর কৌশিক? কৌশিক ছিল আমাদের মুশকিল আসান, নানান কাজে বিশেষ সাহায্যকারী। উঁচু ডালে পেয়ারা? হাত যাচ্ছেনা? কৌশিক তো আছে! খোয়াই থেকে নুড়ি কুড়িয়ে আনার ভারী থলিটা বয়ে নিয়ে আসার দরকার? ভাবনা কি, কৌশিক আছে! অমুকদার বাগান থেকে আনা কোঁচড় ভরা কুল খেতে খেতে, ধানের ক্ষেতের মধ্যে চোরপুলিশ খেলতে খেলতে কখন তৃণা, আমি, আর কৌশিক ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছি পাশাপাশি।

প্রকৃতির নিয়মে এসেছিল কৈশোর, তারুণ্য আর নবযৌবনের নিঃশব্দ জেগে ওঠা। তৃণা আর কৌশিক। খেলার সাথী থেকে কবে যেন তারা একসঙ্গে জীবনের পথ চলার ডাক শুনেছিলো! বকুলবীথি আম্রকুঞ্জের পথে পথে, কোপাই নদীর ধারে, আকাশ অন্ধকার করা কালবৈশাখী মেঘের ছায়ায় গড়ে উঠেছিল তাদের ছোট্ট স্বপ্ন, এক নতুন অনুভূতির আনন্দে। আমি ছিলাম সেই সুন্দর, শুদ্ধ, পবিত্র ভালবাসার একমাত্র সাক্ষী। আমরা তখন ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা দিয়েছি। সেইসময়ে অনেকদিনের চেনা পৃথিবীর সবই নতুন করে মনোহর লাগে। সেই সময়ে কত বিনিদ্র রাতে তৃণা আমাকে শুনিয়েছে তার নিভৃত মনের গোপন কথাগুলি। সেই নতুন রূপকথার গল্প আমার সুন্দর লেগেছে, মনে মনে প্রার্থনা করেছি ওদের এই ভালবাসা সফল হোক। ওরা বিশ্বাস করেছিল ওদের হাতেই সব বাধা-বিপত্তিকে জয় করবার মন্ত্র আছে। মনের সেই গভীর বিশ্বাসকেই পরম সত্যি ভেবে তৃণা আর কৌশিক চিরকাল পাশাপাশি থাকার কথা দিয়েছিল একজন অন্যজনকে। কিন্তু তাদের ভাগ্যের আকাশে যে আসন্ন ঝড় আসছে সেকথা আমরা কেউই ভাবতে পারিনি।

সে দিনটা, আর সব দিনের মতোই প্রথম সূর্যের কোমল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, ভোরের বৈতালিকের সুর তখনও ছড়িয়ে ছিল দিগন্ত ছুঁয়ে, আর আমরা বই-খাতা নিয়ে ক্লাসের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম। যাবার পথে হঠাৎ তৃণাকে ডাক দিয়ে একজন জানালো, ওর বাবা এসেছেন, ওর জন্য অপেক্ষা করছেন। এখনই গিয়ে দেখা করতে হবে। তৃণা প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর কি ভেবে আমার হাতে তার বইগুলো ধরিয়ে দিয়ে বলল, "তোরা যা, আমি এখনই আসছি"। বলে ছুটে চলে গেল। তৃণা আসেনি ফিরে। সারা সকাল আমি আর কৌশিক তার ফিরে আসার পথ চেয়ে ছিলাম।

শান্তিনিকেতনে তৃণার সঙ্গে আমার আর কৌশিকের সেই শেষ দেখা। তৃণার বাবা ওকে সেইদিনই নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন, কারণ, তৃণারবিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল। দুপুরে শ্রীসদনে ফিরে খবরটা পেয়ে হতবাক আমি ছুটেছিলাম কৌশিকের কাছে, বোধহয় আর কি করবো ভেবে উঠতে পারিনি বলেই। সেদিন আমার কাছে সে কথা শোনার পর

কৌশিকের মুখে, প্রথমে অবিশ্বাস ও তারপরেই যে গভীর যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম তা আমি ভুলতে পারিনি কখনোও। কয়েকদিন পরে উদভ্রান্ত কৌশিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তুই আমাকে বলতো,

তৃণা কি সত্যি চলে গেছে?" আমাকে উত্তর দিতে হয়নি, কৌশিক নিজেই চলে গেছে ফিরে। এরপর কৌশিকও শান্তিনিকেতন ছেড়ে গিয়েছে, তারপর আমিও।

এরপর সময় বয়ে গেছে, আর আমরা যে যার মতো জীবনের পথে অনেক দূরে চলে গেছি। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীদের কারো সঙ্গে দেখা হতে শুনেছি কৌশিক আছে বিদেশের কোন এক শহরে, এক স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে। একাই। তার সঙ্গে কারো যোগাযোগ তেমন নেই। হয়তো স্বেচ্ছাকৃত কিংবা অন্য কোনো কারণে। দেশে বা বিদেশে ও নাকি কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চায়না। আমিও বয়ে চলেছি অন্য খাতে। দেশের বাইরে থাকি, মাঝে মাঝে ফিরি, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলেও তৃণার কোনও খবর পাইনা। খোঁজ করবো যে তারই বা উপায় কোথায়? তৃণাকে যে আবার কখনো খুঁজে পাবো সে আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। তাই এবারের দেখা হওয়াটা একেবারেই অভাবনীয়।

কয়েকদিন পরে তৃণার বাড়িতে আবার দেখা হলো আমাদের। তার বাড়ির সেই বারান্দাটিতে, সকালের সোনামাখা আলোয় নয়, আসন্ন রাতের আলো-আঁধারিতে। পার্বতী এসে দু'জনের জন্য দিয়ে গেল দুটি হালকা চাদর। তৃণা আমার একটি হাত তার কোলের ওপর ধরে নিয়ে বলল, "কতদিন পরে এমন করে বসেছি বলতো?" বললাম, "যুগ কেটে গেছে মনে হচ্ছে।" তৃণা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "তুই আমাকে মনে করেছিলি?"

জিজ্ঞেস করলাম, "সেই যে বলে গেলি, আসছি, তারপর কোথায় যে হারিয়ে গেলি? আমাদের কারো কাছে তোর ঠিকানা ছিলোনা আর থাকলেও খুঁজবো যে তারই বা উপায় কোথায়?"

তৃণা জিজ্ঞেস করলো, "আর কৌশিক? ও কোথায় রে?" মনে হলো যেন কোন এক গভীর ব্যথার এক কোণে, ওর বুকের অন্তরালে যে প্রশ্নটি লুকিয়ে ছিল তাকে ও অনেকদিন পরে রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে দিলো। কৌশিকের কথা যতটুকু জানা ছিল ওকে জানালাম, শুনে, কিছুই বললনা, চুপ করে রইলো। ওই চুপ করে থাকার মধ্যে যে কত না বলা কথা লুকিয়ে ছিল, তার কিছুটা হয়তো আমার জানা ছিল, কিন্তু সবটুকু শুধু ওই জানতো, আর কেউ নয়।

সদ্য ফোটা জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ছড়িয়ে ছিল আমাদের ঘিরে। তার চেয়েও মৃদু স্বরে কথা বলেছিল তৃণা। বলেছিল, "জানিস, সবটাই একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল আমার বাবার। একরকমের পুতুল খেলা। আমাকে পাঠালেন শান্তিনিকেতনে, আর যমজ বোন রিনাকে দার্জিলিং-এর কনভেন্ট-এ। দু'জনেরই ১৭ বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমার বিয়ে হলো, বয়েসে আমার চেয়ে প্রায় দু'গুণ, এক শিল্পপতির বিলেতে বড় হওয়া ছেলের সঙ্গে আর রিনা গেলো এক পুরানোপন্থী, একান্নবর্তী বিশাল পরিবারের ছোট বৌ হয়ে। দু'জনেই দিশাহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু অতটুকু বয়সে কিই বা করতে পারতাম? আমাকে শিখতে হলো পার্টি দিতে, নানান drinks-এর নাম শিখতে, আর রিনাকে পূজা-পার্বনের রীতিনীতি! কেউই কোনোদিন সফল হতে পারিনি। কিছুদিন পর, ভীতু আমি, ডুবে গেলাম সংসারের হাজার চাহিদার বন্যায় আর সাহসী রিনা সবার নিন্দা মাথায় করে ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে পাড়ি দিলো অন্য আর এক জীবনের সন্ধানে। কতগুলো জীবন বিফল হয়ে গেল, কেউই সুখী হতে পারলাম না। কে জানে বাবা বোধহয় সুখী হয়েছিলেন!

আমরা দু'জনেই চুপ করে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। রাত গভীর হলো। আকাশের রং কালো হলো, ফুটে উঠলো তারাদের আলোর বাতি। ঠিক যেমন শান্তিনিকেতনের আকাশে দেখা যেত। কত মিল কিন্তু কোথাও কোনো মিল নেই। তৃণাকে দেখা যাচ্ছিল না ভালো করে। তার প্রশ্ন ভেসে এলো, "কোথায় গেল রে কৌশিক?" বললাম, "শুনেছি বিলেতে।একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ এলো কানে, একটু পরে একটা কান্না ভেজা কথা... "বিলেত, সে যে অ-নেক দূর!"

রাতের নিঃশব্দতার মধ্যে পাশের কোনো বাড়ি থেকে গান ভেসে আসছিল –

"আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে
অশ্রুত বাঁশি হৃদয় গহনে বাজে,
আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতোন রাজে..."

মিঠেপান

মৌ পাল

ল্যান্সডাউন রোড-এ নেমে ফুল কিনতে গিয়ে পাশের পানের দোকানটাতে চোখ পড়ল। বেশ বাহারি দোকান। অনেকরকম পান সাজানো আছে। কি মনে হতে দোকনিকে বললাম "একটা ভালো দেখে মিঠে পান সেজে দিন তো। মশলা ভালো করে দেবেন কিন্তু। সুপুরি কম, আর খয়েরটা একটু বেশি; ঠোঁট যেন লাল হয়।"

দোকানি হেসে বলল, "তাই দেব দিদি। আমার দোকানের মিঠে পান একবার খেলে আর ভুলতে পারবেন না।"

মুখে দিয়ে বুঝলাম সত্যি, বেশ ভালো বানিয়েছে।

পানের স্বাদ আর গন্ধ হঠাৎ এক ঝটকায় নিয়ে গেল আমার ছোটবেলায়।

তখন বয়স কত হবে, এই নয়-দশ। ঠাকুমার পানের বাটার ওপর খুব নজর ছিল। ভালবাসতাম পান খেতে আর ঠোঁটটা টুকটুকে লাল করে আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে। এদিকে বাড়িতে জ্যেঠু আর বাবার কড়া শাসন - ছোটরা যেন সবরকম নেশার জিনিস থেকে দূরে থাকে। ঠাকুমা বুড়ি মাঝেসাজে লুকিয়ে চুরিয়ে দিত, কিন্তু সে আর কতটুকু। আর একটা জায়গায় ছাড় ছিল অবশ্য। সে হচ্ছে বিয়েবাড়ি। আর বিয়ে বাড়ির পানের মজা-ই ছিল আলাদা। কোথায় লাগে তার কাছে ঠাকুমার সাদা পান। কি সুন্দর লাল-হলুদ রঙের কতরকম মশলা দেওয়া থাকত আর পানের ওপরটা মোড়া থাকত রুপোলি তবকে।

সময়টা আশির দশকের শেষের দিক। কলকাতা তখন দ্রুত বদলাচ্ছে। ব্যাচ পেতে খেতে বসা আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে সেকেলে স্টাইল আর বুফে তখন নতুন স্টেটাস সিম্বল। আমার স্কুল/পাড়ার বন্ধু পরমার দিদির বিয়ে-তে আমাদের বাড়িশুদ্ধ সকলের নিমন্ত্রণ। পরমা খুব জাঁক করে বলেছিল বুফে থাকবে আর থাকবে একটা আলাদা পানের ষ্টল। একজন সেখানে দাঁড়িয়ে শুধু পান বানিয়ে যাবে, যতবার খুশি নিতে পার। আমার আনন্দ আর ধরে না। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম দিনটার জন্য। জামা, ম্যাচিং হেয়ারব্যান্ড আর জুতো - সব প্রস্তুত। কিন্তু বিধি বাম। বিয়েবাড়ির এক দিন আগে থেকে ধূম জ্বর। অগত্যা মা আর আমি বাড়ি বসে রইলাম আর জ্যেঠিমা, কাকিমা, দাদা, দিদি সবাই কেমন মজা করে বিয়ে বাড়ি গেল।

আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। ঠাকুমা, জ্যাঠা, কাকা - সবাইকে নিয়ে হৈহুল্লোর-এ ভরা একটা বাড়ি। আমার নিজের কোনো ভাইবোন ছিল না। কিন্তু জ্যাঠার ছেলেমেয়েকেই আমি দাদা, দিদি হিসেবে জানতাম। দাদা একটু পাগলাটে ছিল। কাণ্ডজ্ঞান একটু কম, ফলে আমরা ভাইবোনেরা সবসময় দাদাকে আগলে রাখতাম। তবে আমাকে ভালবাসত খুব।

বিয়েবাড়ির রাত্রে কিছু না খেয়ে রাগ করে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গলো একটা চেঁচামেচিতে। ঘরের বাইরে এসে দেখলাম জ্যেঠু দাদাকে খুব বকছে।

"এই সেদিন নতুন সাদা পাঞ্জাবী করিয়ে দিলাম তোকে। এর মধ্যেই বারোটা বাজিয়ে দিলি? কোথা থেকে পুরো লাল রং মাখিয়ে এনেছে! এই তোর পকেটে হাত কেন, কি আছে ওখানে?" দাদা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। সপাটে একটা চড় এসে পড়ল গালের উপর। চোখ দিয়ে জল পড়ছে দরদর করে, কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই। শেষমেষ জ্যেঠু যে কথাটি প্রায় বলেন, সেটি বলেই বিদায় নিলেন - "এই হাবা ছেলেকে নিয়ে যে আমার কি হবে, বিশ্বনাথই জানেন।"

জ্যেঠু চলে যাওয়ার সাথে সাথে দাদা আবার নিজমূর্তিতে। হি হি করে হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরে। তারপর হাতের মধ্যে গুঁজে দিল একমুঠো চটকে যাওয়া পান। "দেখ, কেমন চালাকি করে তোর জন্য বিয়েবাড়ি থেকে চুপিচুপি এনেছি!" আমি খুব খুশি, কিন্তু কষ্ট-ও হচ্ছে ভালোমানুষ দাদাটার জন্য।

"কেন আনতে গেলি দাদা? এত সুন্দর পাঞ্জাবীটা নষ্ট হয়ে গেল। জ্যেঠু তো হেবি ক্ষেপে গেছে তোর উপর।"

"ধুর! ও তো রোজকার ঘটনা। নে, এখন পানগুলো খা তো। আমাকেও একটা দিস।"

এখনো মনে পড়ে দুই ভাইবোনে মিলে কি মজা করে পানগুলো খেয়েছিলাম।

তারপর তো আস্তে আস্তে দিনগুলো বদলে যেতে শুরু করলো। মেজো কাকিমার ছেলের স্কুল-এর সুবিধার জন্য কাকারা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। দিদি বিয়ে করে চলে গেল জামশেদপুর। এদিকে ছোটকাকার বিয়ে হওয়ার পর থেকে বাড়িতে শুধু অশান্তি। একদিন আমিও পাড়ি দিলাম বিদেশে। তারপর তো সেখানেই settle করে গেলাম। বাবা মা কে নিয়ে এসেছি নিজের কাছে। এর মধ্যে যতবার ল্যান্সডাউন এর বাড়িটাতে গিয়েছি, দেখেছি বাড়িটা ধীরে ধীরে শুধু কাঁটাছেঁড়া হচ্ছে। পাঁচিলের পর পাঁচিল; যাদের সাথে শোওয়া বসা ছিল, তাদের সাথে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। একজন কিন্তু বদলায়নি। আমার সেই ভালোমানুষ দাদাটা। সেই হাবা ছেলেই শেষবয়সে জ্যেঠুর দেখাশোনা করত আর চেষ্টা করত আমাদের সব ভাইবোনেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখার। আমরা যদিও সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম নিজেদের জীবন নিয়ে, তাই দাদা বিশেষ পাত্তা পেত না।

এখন সেই একমাত্র যোগসূত্রটাও হারিয়ে গেল। কয়েকদিন আগে দাদা চলে গিয়েছে। ঘটনাচক্রে আমি কিছুদিন হলো কলকাতায় এসেছি। তাই, কিছুটা অন্তরের টান থেকে আর কিছুটা সামাজিকতার খাতিরে আজ আমি যাচ্ছি আমাদের সেই পুরানো বাড়িতে দাদার কাজের অনুষ্ঠানে। সংসার, চাকরি, এতসব ব্যস্ততার মাঝে নিজের অতীত, পুরানো সম্পর্কগুলো ভুলে যেতে বসেছিলাম। আজ এই মিঠে পানটা আবার অনেকদিন আগের একটা মিষ্টি স্মৃতি ফিরিয়ে এনে দিল।

Anuradha Mukherjee
Milonee President 2023

Milonee Committee Members 2023

Saraswati Puja 2023

REX ROOFING
& RESTORATION, LLC

Hail Damage? We handle
EVERYTHING!

Call in September for a free upgrade to a Class 4 Hail-resistant roof!

- Roofing (Tile Roof Specialists)
- Guttering
- Windows
- Stucco
- Painting & Siding

BBB A+ ACCREDITED BUSINESS

www.rexroofing.com | 720.467.6005

Angi 2022 Super Service Award

ALPINE TRAVEL & TOURS

from dream to destination

Explore The World WITH US

OUR SERVICES

- Air, Hotel, Car
- Luxury Travel
- Vacation Packages
- Guided Tours
- Adventure Holidays
- River & Ocean Cruises
- Travel Insurance
- Group Travel
- Safari
- All Inclusive Vacations
- ....and more

ABOUT US

Our mission is to provide a personalized, responsive travel experience with complete attention to detail, best price possible and end to end customer service

Eby Johnson

Owner/Operator

www.alpinetravel.com
Eby@alpinetravel.com
303 200 4540 - Office
303 601 8888 - WhatsApp